### পঞ্চম অধ্যায়

## শিষ্ট সাহিত্য ও অপর সাহিত্য : দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল

শিষ্ট সাহিত্য সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট, প্রচারিত, আস্বাদিত। বিপরীতে অপর সাহিত্য বিপুল সংখ্যক মানুষের মানসিক আমোদের যোগানদার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে তার রুচিকে তৃপ্ত করলেও পরিণামে তার জিত হয়নি। কারণ সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে হার-জিতের বিচার হয় না। হার-জিত নির্ভর করে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির ওপর, যে ক্ষমতা এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় শিষ্টবর্গের হাতে আবদ্ধ। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ প্রকারের বিন্যাস থাকে। সেই বিন্যাসের সূত্র ধরে বলা চলে যে প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি বরাবর তাদের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নির্বিচারে চাপিয়ে দিতে চায় তথাকথিত শাসিতের ওপরে। শাসক আর শাসিতের প্রভুত্ব এবং অধীনতার সম্পর্কের মধ্যে ধরা পড়ে শ্রেণি-দ্বন্দ্বের নানা অসম অভিব্যক্তি। ঠিক একইভাবে উচ্চবর্গ চায় নিম্নবর্গের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চেতনার সার্বিকতায় বিলীন হয়ে যাক। তাই চিরকালই উচ্চবর্গ যে কোনও ক্ষেত্রে নিজের মনোনীত বিষয়কে প্রাধান্য দেয় এবং তাকে সমাজ-মনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বার্থে চেষ্টা চালায়। উনিশ শতকেও নব্য শিক্ষার গর্বে গর্বিত শিষ্ট সমাজের ধারক-বাহকেরা ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির সাহচর্যে নিজেদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক রুচিকে পুনর্নির্মাণ করার কাজে মেতে উঠেছিল। এমনভাবেই তার কাঠামো নির্মিত হয়েছিল যাতে তা প্রভুশক্তির অনুমোদন পায়। আসলে কলোনির প্রভুদের প্রদত্ত শিক্ষার অসারতা তখনো তাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠেনি। তখন ছিল উজ্জ্বল আগামীর স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গের অনুভব তখন ছিল দূরাগত আবছায়া মাত্র। খণ্ডিত আত্মমর্যাদা তখনও পীড়ন করতে শুরু করেনি বিবেককে। নব্য-শিক্ষা বলে উজ্জ্বল আর রঙিন ভবিষ্যতের একটা পর্দা তখন তাদের চোখের সামনে মেলে দেওয়া হয়েছিল। জীবিকা আর জীবনধারণের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত মেধাজীবী বাঙালি স্বাভাবিক কারণেই সেদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। বাঙালি সমাজের এতকালের কৃপমণ্ডূকতা তাতে কিছুটা ছিন্ন হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মোহে পড়ে পাশ্চাত্যের সবকিছুই শ্রেষ্ঠ আর আমাদের এতকালের সবকিছুই নিকৃষ্ট---এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তাদের মস্তিষ্ককে অধিকার করে নিয়েছিল। নতুনের মোহ অত্যন্ত সাংঘাতিক। নতুনের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহজেই অতীতকে অস্বীকার করতে চায়। শ্যামলী চক্রবর্তী (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন :

'ইংরেজ শাসনের কারসাজিতে গড়ে ওঠা নতুন রুচি ও চাহিদার মোহে সমগ্র সমাজ সহজ ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং স্বাভাবিকতা হারিয়ে হয়েছিল উদ্ভ্রান্ত।'

ইন্ধন যুগিয়েছিল প্রভুশক্তি আর অক্ষরে অক্ষরে তাদের নির্দেশ কার্যকরী করতে শুরু করেছিল পাশ্চাত্য প্রভুর অনুগত এদেশের ভদ্র শ্রেণি। সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের এই খেলায় 'কলোনির কলের পুতুল'রা স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিল প্রভু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে। পাশ্চাত্যমনক্ষ এই শিষ্টবর্গের দাপটেই ক্রমশ নির্বাসিত আর পরজীবী হওয়ার যন্ত্রণায় দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল। এক অসম যুদ্ধে সে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। তার পশ্চাদপসরণ হয়ে উঠছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। অন্তহীন অভিমানে ভদ্রসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে তার স্থান হয়েছিল তথাকথিত প্রান্তে-বাসীর প্রাঙ্গণে। অকরুণ নিঃস্পৃহতায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের মর্মের যোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল প্রাণের উৎস শুকিয়ে যাওয়া মানুষগুলো। তাদের অবস্থা যথার্থ প্রতিভাত হয়েছিল আগামী দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায়, যেখানে তিনি বললেন :

'আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল।'

দেশজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের বদলে যাওয়া দৃষ্টিকোণ এবং জীবনবোধকে এমন অসামান্য ভাবেই ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ। জানালেন শুধু আর্থিক দুর্দশা ও পার্থিব সম্পদের বহির্গমনই একমাত্র শোচনার কারণ নয়, আত্মিক পতনও সমান যন্ত্রণাদায়ক আর গ্লানিকর। তাঁর মনে হয়েছিল:

'দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি---কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায় দেশের সহিত যত কিছু কল্যাণ সম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেন্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে?'

কিন্তু আমাদের রুচি সাহেবদের দোকানে বিকিয়ে যাওয়ার ঘটনাও আকস্মিক নয়।
শিক্ষিত বাঙালির রুচি বদলের জন্য যে নীল নকশা রচিত হয়েছিল তার আড়ালে
ক্রিয়াশীল ছিল সাম্রাজ্যবাদী লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশের ইতিবৃত্ত। নিজেদের
মনোমত ছাঁচে উপনিবেশের প্রজাদের গড়ে নিতে পারলে সবদিক থেকেই প্রভুশক্তির
মঙ্গল, একথা বুঝতে শাসকশ্রেণির ভুল হয়নি। তাই দীর্ঘসময় ধরে, রীতিমত পরিকল্পনা
করেই উপনিবিষ্টের চৈতন্যের দখল নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কারণ তারা জানত

আসল যুদ্ধ রণভূমিতে হওয়ার আগে মনোভূমিতেই হয়। আর একবার মনের দখল নিতে পারলেই কেল্লা ফতে। তখন মগজ ধোলাই হয়ে যাওয়ার ফলে যে কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, তেমনই শিষ্ট নাগরিক সমাজের রুচি বদলের ক্ষেত্রেও নানা পূর্ব-ভূমিকা রচিত হয়েছিল শাসক সম্প্রদায়ের হাতে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'লুঠেরার কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু জয় যখন বিজিত দেশে ক্ষমতা কায়েম করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, বিজেতাকে তখন ইতিহাস চেতনা ব্যবহার করতে হয় প্রভু সংস্কৃতির একটি উপাদান হিসেবে। সব বিজেতার পক্ষেই একথা খাটে, তবে অবস্থা ভেদে ওই চেতনার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে।'

সে ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের ইংল্যান্ডে। সেখানে পরিবর্তনশীল সমাজের নৈতিক পরিমণ্ডলেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতের উপনিবেশের মন-মানসিকতার দখলদারির গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি।

### প্রথম পরিচছেদ

### প্রসঙ্গ উপনিবিষ্টের চৈতন্য-অধিকার

ইংল্যান্ডে আঠারো শতকের শেষদিকে ঘটেছিল ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল পুনরুত্থান। ইভ্যাঞ্জেলিক্যালদের স্থির বিশ্বাস ছিল ইতিহাসের ভিতর দিয়েই ব্যক্ত হয় ঈশ্বরের নিগৃঢ় অভিপ্রায়। সুতরাং ইংরেজদের ভারতবর্ষে ক্ষমতা-বিস্তারও তারই ফলাফল। ভারতে কোম্পানির কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের মধ্যে অন্যতম স্যার জন শোর (১৭৫১-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) পরিগণিত হয়েছিলেন ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল ফাদার হিসেবে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এই তত্ত্বের কিছুটা প্রভাব ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে 'অবসারভেশনস্ অন দি স্টেট অফ সোসাইটি অ্যামং দি এশিয়াটিক সাবজেক্ট্রস্ অফ গ্রেট ব্রিটেন, পারটিকুলারলি উইথ রেসপেক্ট টু মরালস্, অ্যান্ড অন দি মিনস্ অফ ইম্প্রুভিং ইট' বলে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন গ্রান্ট। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেটি কোম্পানির পরিচালন সমিতির সামনে পেশ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সেটি সংসদীয় দলিল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং নীতিগত ভাবে তাঁর মত স্বীকৃত হয়েছিল। গ্রান্ট মনে করতেন:

'খ্রিস্টান ধর্মের ঐতিহ্যের মধ্যে পাশ্চাত্যের যে শ্রেষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশিত, ভারতবাসীর কাছে সেই মূল্যবোধ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের প্রকৃত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বিদ্রোহ প্রশমনের সবচেয়ে ভাল পন্থা খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা। কারণ খ্রিস্টিয় ধর্মাদর্শই এদেশীয়দের বহু ঈশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মের কবল থেকে উদ্ধার করবে। এবং ইংরেজদের উপনিবেশবাদের যে আত্তীকরণ পরিকল্পনা ছিল, খ্রিস্টান ধর্মাদর্শ শিক্ষা এদেশীয়দের সেই পরিকল্পনার অংশীদার করবে।'

সব ইভ্যাঞ্জেলিক্যালদেরই বক্তব্য ছিল ভারতীয়দের, বিশেষত হিন্দুদের দুর্গতির মূল তাদের ধর্ম। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই তাদের কোনও অবদান নেই, তাদের কোনও উন্নতির আশা নেই, যদি না তারা সুশিক্ষিত হয়ে খ্রিস্টিয় সদাচারের মহান আদর্শকে বরণ করে নেয়। জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হলেই তাদের চিত্তগুদ্ধি ঘটবে, তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, কুসংস্কার ত্যাগ করে যুক্তি-পরায়ণ হয়ে উঠবে, এই যুক্তির দ্বারাই তারা অনুভব করতে পারবে ব্রিটিশ শাসন তাদের জীবনে স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সুতরাং তারা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে এই শাসনকে স্বীকার করে নেবে। আর এর ফলে ব্রিটিশ শাসন আরও বেশি পোক্ত হবে, তারা নিরাপদে ভারতবর্ষ নামের স্বর্ণপ্রসূ উপনিবেশ থেকে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবে, এখান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নির্মিত সামগ্রী এদেশেরই বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে ফুলে ফেঁপে উঠবে কোম্পানির কোষাগার। এভাবেই ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রথম পর্বে বাহ্যিক দখলদারির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিকার করে ফেলা হবে মানুষের চৈতন্য। উপনিবেশের প্রজাদের মনে খেদ থাকবে না, অভিযোগ থাকবে না, ফলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা বা গোপনে অন্তর্যাতের আশঙ্কা দুই-ই অবলুপ্ত হবে।

প্রাথমিকভাবে তাঁদের সে প্রত্যাশা ব্যর্থও হয়নি। সমকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেরই মনে হয়েছিল ইংরেজের অধীনতা-স্বীকার উত্তরকালে ফলদায়ী হবে। ইংরেজের রীতি নীতি, আইন কানুন সমস্ত কিছুর প্রতিই বুদ্ধিজীবীদের ছিল অগাধ আস্থা। সমস্ত কুলীন পত্রপত্রিকাতে তো বটেই, এমনকি বটতলার বইতেও প্রকাশিত হয়েছিল সেই আস্থার আশ্বাসবাণী:

'ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আইনগুলি অতিশয় উত্তম ইহাতে প্রজাদিগের অপকারের নিমিত্ত একটীও বর্ণ অঙ্কিত থাকে না কেবল শিষ্ট পালন ও দুষ্ট শাসন উক্ত নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য। বলিতে কি হিন্দুগণ যখন সাধিন ছিলেন, তখন যে এপ্রকার সুখে থাকিতেন তাহাও বোধ হয় না। রাজার যে কয়টী গুণ তাহা কেবল ইংরাজেরাই অধিকার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'<sup>৬</sup>

আর শিক্ষিত শ্রেণির স্থির বিশ্বাস ছিল ইংরেজি শিক্ষা খুলে দেবে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। বঙ্গসমাজের বহু রথী-মহারথী তো বটেই, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরও এতে দ্বিমত ছিল না। সুতরাং জােরকদমে শুরু হয়েছিল উপনিবেশের প্রজাদের নিজেদের উপযুক্ত ছাঁচে শিক্ষিত করে তােলার কাজ। প্রথমে দেশীয় ভাষাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের সিদ্ধান্ত হলেও তা একসময় প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদিকে জীবন ও জীবিকার তাগিদেও ইংরেজি ভাষার প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঝােঁক বাড়তে থাকে। ফলে দুটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসে দাঁড়ায়। এক, শিক্ষাদানের জন্য কােন মাধ্যমকে বছে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে এবং দুই, কাদের সর্বপ্রথম সেই আলােক-বৃত্তে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এই নিয়ে নানা তর্কবিতর্কের পর প্রাচ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্য ভাষার দিকেই গরিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ১৮২৪ খ্রিস্টান্দে লন্ডন থেকে প্রেরিত দেশীয়দের শিক্ষা-বিষয়ক ডেসপ্যাচে স্পষ্ট জানানা হয়েছিল যে এতদিন প্রাচ্য বিদ্যাকেন্দ্রগুলি স্থাপন করা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ প্রাচ্যবিদ্যায় কোনও সারবত্তা নেই, বরং তা লঘুচিত্তকে উসকে দিতে পারে। ১৮৩০ খ্রিস্টান্দের ২৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানির পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে জানানাে হয় যে:

'ভারতীয়দের বৃদ্ধি ও নীতির উন্নয়নের খাতিরে সর্বাগ্রে সমাজের ওপর তলার লোকদের দিকে নজর দেয়া উচিত; কারণ এক, তাদের অবসর আছে; এবং দুই, নিম্নশ্রেণির মানুষদের ওপর তাদের রয়েছে 'স্বাভাবিক প্রভাব'; বিত্তশালীদের যদি উন্নত মানের শিক্ষায় দীক্ষিত করে তোলা যায়, তাহলে একদিন-না-একদিন বদলে যাবে সমাজের সব স্তরের মানুষদের ধারণা ও অনুভূতির জগৎ, পালটে যাবে সমষ্টি-মনের কাঠামো।'

ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) সম্পাদিত 'দি ক্যালাইডোক্ষোপ' পত্রিকায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এক প্রবন্ধ, যেখানে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য ছিল:

'প্রাচ্যবাসীরাও মানুষ, সুতরাং তাদের অন্তরেও জাগতিক উন্নতির স্পৃহা বর্তমান; সুবুদ্ধিচালিত সরকারের এই সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়, নকলনবিশ বাঙালিদের সুযোগ দিলে, কাছে টেনে নিলে, আফ্রিকাবাসীদের মতন তারা শাদা-বিদ্বেষী বনবে না; এবং এভাবেই, সুকৌশলে, গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা-অনুভূতি-উপলব্ধিকে শুল্র-শোভিত করা যাবে।'

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই মেকলে (১৮০০-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) নিজের বক্তৃতায় একথাই জানিয়েছিলেন যে কলোনিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও তেমন ক্ষতি নেই. কিন্তু অর্থনৈতিক অধীনতা-পাশ যেন কিছতেই ছিন্ন না হয়। তিনি একই সঙ্গে চেয়েছিলেন কলোনিতে বাজারের সম্প্রসারণ এবং কলোনির অধিবাসীদের চৈতন্যের সর্বাঙ্গীণ অধিকার। আর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনিই রচনা করেছিলেন শিক্ষা বিষয়ক সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব। যার ফলস্বরূপ দেশীয় ভাষাগুলির গুরুত্ব হাস হয়ে এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য। আর তাঁর নানা যুক্তি-বিন্যাসের ফলে ইংরেজি সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বজ্ঞানের আকর হিসেবে। গৌরী বিশ্বনাথন (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন যে, '১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগেও ভারতে নানারূপে ইংরেজি শিক্ষা চালু ছিল। মুখ্যত আগে ভাষা হিসেবেই ধ্রুপদী ঢঙে ইংরেজি চর্চা করা হত। কিন্তু এখন আধুনিক জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা শুরু হয়ে যায়। ইংরেজি-চর্চায় এই হল অবস্থান পরিবর্তন। মনে করা হত শোষণ ও পীড়নের ইতিহাস থেকে সযত্নে পৃথকীকৃত ইংরেজি সাহিত্যই ইংরেজদের স্বরূপের আদর্শ প্রতিরূপ। অধিকন্ত ইংরেজি সাহিত্য ভারতীয়দেরকে নৈতিকতায়, জীবনযাত্রা-নিয়ামক নিয়মাবলীতে এবং সঠিক আচরণে উপযক্ত শিক্ষা দেবে. এবং এইভাবে একদল এদেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। এটাই ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচী।'<sup>৯</sup> মেকলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন :

'To sum up what I have said: I think it is clear that we are not fettered by any pledge expressed or implied; that we are free to employ our funds as we choose; that we ought to employ them to teaching what is best worth knowing; that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic; that the natives are desirous to be taught English and are not desirous to be taught Sanskrit or Arabic; that neither as the language of law nor as the language of religion, have the Sanskrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement; that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars; and that to this end our efforts ought to be directed.' Do

এদেশে মেকলের অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে দেরি হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

'হিন্দু কালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।...নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন;--প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোঁক বঙ্গসমাজে বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।'১১

এ বিষয়ে বাঙালির মোহাবেশ যে অনেকদিনই ছিল তার প্রমাণ সেকালের আরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পাওয়া যেতে পারে। যেমন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'এ ইয়ং হিন্দু' নাম দিয়ে এক প্রবাসী যুবকের একটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (ভাদ্র ১৮০০) প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে সেই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজ শাসন স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তা না হলে ভারতবর্ষের সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা। স্বেচ্ছায় ইংরেজ-বশ্যতা স্বীকার করে নিলে একদিন ভারতবর্ষ আধুনিক রাষ্ট্র হয়ে উঠবেই। আর তার অন্যথা হলে ভারতবর্ষ আবার তলিয়ে যাবে প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের নিঃসীম অজ্ঞতার তিমিরে। মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে। সমালোচক পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন:

'কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে দিলেও, বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ মশালগুলো জ্বলেছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে। দূরে ভারতের ভিন্ন প্রান্তে। তবুও অমন দূরের আগুনের আঁচেও ঝলসাতে হল কলকাতাকে। ঝলসাতে হল বিদ্রোহের সমর্থনে হাত না তুলেও। সমর্থন না জানিয়েও কলকাতাবাসীকে হতে হল শাসক ইংরেজের সন্দেহভাজন, আর অধিবাসী ইংরেজদের দুচোখের বিষ। পত্র-পত্রিকার খোল-কত্তালে ইংরেজি সুশাসনের উচ্চকণ্ঠ কীর্তনের সুর বাজিয়েও বাঙালি সমাজের রেহাই মিলল না অনাকাঞ্জিত অপমান থেকে।'১৩

একথা সত্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙালি ভদ্র শ্রেণি দ্বিধাহীনভাবে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহকে নিন্দা করে ও ইংরেজ সরকারকে সমর্থন

জানিয়ে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে বাঙালিদের দুটি সভার খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (২৬/৫/১৮৫৭) :

'সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার সম্ব্রান্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সিপাহীদের বিদ্রোহকে নিন্দা করিয়া এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।'<sup>১৪</sup>

অপর সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৫/৫/১৮৫৭ তারিখে, সভাপতিত্ব করেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, উপস্থিত ছিলেন রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হীরালাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ মল্লিক, শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। উপরোক্ত সভার মতোই প্রস্তাব গৃহীত হয়, বিভিন্ন সভার মধ্যে:

'several gentlemen, large landed proprietors, demanded that Government should be solicited to arm their retainers, in belief of the authorities; and declared that the peasants and the inhabitants of the country were so loyal and faithful as themselves, and were waiting anxiously to hear that the Government had with a strong hand put down its enemies.'

ইংরেজরা একে তুচ্ছ ভাবে নেয়নি। ফলে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য 'বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্তে লাগ্লো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠ্লো।

'বিলাত থেকে এলো গোরা, মাথায় পর কুর্তি পরা, পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যান্ড নিবাসী তারা। টানটিয়া টোপির মান, হবে এবে খবর্বমান,

সুখে দিল্লী দখল হবে, নানা সাহেব পড়বে ধরা। '<sup>১৬</sup>

রসিক হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন:

'বাঙ্গালিরে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,---"যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন--বহুদিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকান্দের মত হতে পারেননি।'<sup>১৭</sup>

একথা ঠিক যে শিক্ষিত ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনকে মনে করত বিধিনির্দিষ্ট। তাই উনিশ শতকে প্রথম অর্ধের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে তারা ধিক্কার জানান এবং পরে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে তাঁদের কোন সায় ছিল না। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে সেই আনুগত্যের নিচেই বিকশিত হচ্ছিল ব্রিটিশ অধীনতামূলকতার অপমান সম্বন্ধে তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। তাই দ্বিধা যে একেবারেই ছিল না, সেকথা জাের গলায় বলা যায় না। হৃদয় এবং মস্তিক্ষের দ্বন্দের সেই কথা ধরা আছে Hindoo Patriot এর পাতায়। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই উল্লেখ করেছেন '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় কলকাতার শিক্ষিতদের নির্লজ্জ আনুগত্য প্রদর্শনের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল বেশ খানিকটা দ্বিধা। Hindoo Patriot-এ একটি আত্মদর্শনমূলক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'এই আনুগত্যের উৎস মস্তিষ্ক, হৃদয় নয়।'' তবে সাধারণ বাঙালির জীবনযাত্রা এর ফলে তেমন কিছু বিপন্ন হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ বাঙালির তাবনা চিন্তা সম্পর্কে জানতে গেলে পুরোনো স্মৃতিচারণের স্মরণ নেওয়া যেতে পারে। যেমন রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর স্মৃতিকথনে জানাচ্ছেন:

'মিউটিনির সময় মিউটিনিকে জানতুম 'সেপাই ক্ষেপা' বলেই। পশ্চিমের সেপাইরা সব ক্ষেপে উঠেছে, সাহেবদের সব ধরে ধরে মেরে ফেলছে, মেমরা ছেলে কোলে করে পালাচ্ছে, এই সবই শুনতুম, কিন্তু সেপাই কাকে বলে, তা কল্কেতায় তখন দেখিনি...মিউটিনি কলকাতার সাধারণ লোককে বিশেষ কিছু ব্যতিব্যস্ত করেনি; এখানকার গৃহস্থ লোকের—বড়লোকেরও মনে একটা আতঙ্ক উঠেছিল মিউটিনির পর। সেপাই ঠাণ্ডা করে গোরারা যখন কল্কেতায় এসে পদার্পণ করলেন, তখন অনেক

বাড়ীর লোকেরই আর সদর দরোজা খুলে রাখবার সাহস হল না 

। ১১৯

এদিকে ইংরেজ পক্ষাবলম্বী শিক্ষিত ভদ্র-শ্রেণি যেন-তেন-প্রকারেণ এই বিদ্রোহ দমনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্বদেশের বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের প্রতি সহমর্মিতার ইঙ্গিত কোথাও লক্ষিত হয়নি। রানি ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) উদ্দেশে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) কবিতায় উল্লেখ আছে :

'এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেব না মা সে ভাবনা সেই ''তাঁতিয়া টোপীর'' মাথা কেটে আমরা ধরে দেব ''নানা''।'<sup>২০</sup>

সুতরাং এই সংগ্রামে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কোনও রকম অংশগ্রহণ ছিল না, বরং তাঁরা ভীত হয়েছিলেন এটা মনে করে যে, এই বিদ্রোহের কারণে তাঁদের সামাজিক উন্নতির পথ কিছুটা হলেও রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বছরে ভারতবর্ষে মহারানির শাসন কার্যকর হলে ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণি যথেষ্ট পুলকিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ২ তারিখে একটি আইন পাশ করা হয় যার নাম ছিল 'অ্যাক্ট ফর দি বেটার গভর্নমেন্ট অব্ ইভিয়া'। সেই আইন অনুযায়ী রানি ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়। আর মন্ত্রীসভার এক সদস্যকে ভারতের জন্য সচিব পদে (সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া) নিয়োগ করা হয়। ১লা নভেম্বর থেকে উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার কথা ছিল। ঐ দিনই রানি একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। সেই ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ভারতীয়দের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা মেনে চলা হবে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রথা প্রকরণ অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করা হবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থান প্রসঙ্গে সাংবিধানিক এই পরিবর্তনের অর্থের সারাৎসার করেছেন বার্নার্ড কোন্ (১৯২৮-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বলেছেন যে, 'শব্দগত ধারণায় দেখা যায় ব্রিটিশ এদেশে তাদের শাসন শুরু করেছিল, 'বহিরাগত' হিসেবে, নিজেদের সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারতের সার্বভৌমত্বকে সঁপে দিয়ে তারা হয়ে উঠেছিল 'ভেতরের লোক'...।'<sup>২১</sup> সে দিনের কথা প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু জানাচ্ছেন:

> '১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর কল্কেতায় এক নূতন কাণ্ড হয়ে গেল ৷...বীডন সাহেব...গবর্মেণ্ট হাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি রাজঘোষণা পাঠ করেন, যাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রজা জানতে পারে যে, আজ থেকে এই ভারত সাম্রাজ্যে আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য থাকবে না, স্বয়ং ভারতেশ্বরী

মহামহিমাম্বিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই রাজ্যের ভার স্বীয় রাজহন্তে গ্রহণ করলেন। শিক্ষিত ভারতবাসী আজ পর্যন্ত এই প্রোক্লামেশনের গর্বের্ব গর্বিত; বলেন, এই প্রোক্লামেশন তাঁদের ম্যাগনাকার্টা, এই প্রোক্লামেশনের বলেই রাজচক্ষুতে ইংরাজ ও আমরা সমভাবে প্রজা।

হুতোম সেই সময়ের প্রকৃত অবস্থা চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন:

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্রেম কল্পেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না" বাড়ি বাড়ি গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রেক্রেমেসনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হল।'<sup>২৩</sup>

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সভ্যজাতির অনুগত প্রজা হবার আনন্দ অনেকেই গোপন করেননি। সেদিন 'সন্ধ্যার পর কল্কেতায় খুব আমোদ হয়েছিল। এই শহরে সেই প্রথম পাবলিক ইলুমিনেশন অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান, জৈন প্রভৃতি সকল অধিবাসীর একদিনে দেওয়ালী। তখন কল্কেতা গ্যাস দেখেনি, কেরোসিন দেখেনি, ইলেকট্রিকের টিকীটি পর্যন্ত তখন য়ুরোপেরও নজরে পড়েনি; সরষের তেল তখন কল্কেতায়-ও টাকায় বোধ হয় ৫ সেরের উপর, দেদার জ্বালাও, তার উপর রেড়ি আছে, নারিকেলও আছে। এক টাকা পাঁচ সিকে শ কাঁচের লম্প, সেইটি ত তখন আলো দেবার বড়মানিষি…লাটের প্রাসাদ, বড় মানুষের বারান্দা, দুঃখীর কুটিরের চালা সবই আলোক-মালায় শোভিত হয়েছিল। বং

এটা আলো নাকি আলেয়া তা বুঝতে পারেননি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়। বরং সমাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল তাঁদের মন। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছিল :

'আমাদিগের জননী স্বরূপা ইংলন্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী শ্বেত কৃষ্ণ সকল জাতির প্রতিই সমান স্নেহ করিয়া থাকেন এবং যাহারা তাঁহার শিষ্ট পুত্র গণের প্রতি অত্যাচার করে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে বিধি মতে শাসন করিবেন, ইহাতে যদি কেহ দোষারোপ করে তবে সে ব্যক্তি নিতান্তই রাজভক্তি শূন্য এবং ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী।'<sup>২৫</sup>

আর আরও নিবিষ্ট চিত্তে শুরু হয়েছিল নতুন পথে পরিক্রমা। এভাবেই ক্রমশ তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা আর সভ্যতার সোনার হরিণের খোঁজে বেরিয়ে আন্তে আন্তে হারিয়ে

ফেলছিলেন নিজেদের অস্তিত্বের শিকড়। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শুধু ভৌগোলিক ভাবেই অধিকার করেনি, তাদের জ্ঞান এবং চেতনার জগতকেও দখল করেছিল। এর ফলেই এদেশের ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার অনেকটা ক্ষমতা লাভ করেছিল তারা। আর তাদের কৌশলে এক মতাদর্শগত বিভেদ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সেযুগের উচ্চ আর নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে রচিত হয়েছিল নতুন এক ব্যবধান এবং গড়ে উঠেছিল অপরিচয়ের নতুন আড়াল। আসলে হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চিত্তেও চমক লাগিয়েছিল। ফলে এতকালের পরিচিত সমস্ত কিছুই ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছিল নব্য সম্প্রদায়ের কাছে। এ যেন 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে…।' সেই নতুন খেলায় মেতে উঠেই তারা নির্বিচারে পরিত্যাগ করেছিল পুরোনো আচার-বিচার, প্রথা-সংস্কার, এমনকি সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও। উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাস সেই গ্রহণ-বর্জনের সাক্ষ্য-বাহী।

# দ্বি তীয় পরিচ্ছেদ উপনিবিষ্টের রুচির রূপান্তর

উনিশ শতকের কলকাতায় দ্বিধাবিভক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেছেন :

'এক দিকে অভিজাতদের শিল্প-সাহিত্য, অন্যদিকে নিম্নবর্গের গান-বাজনা---এ দুটি ধারা সমস্ত শতক ধরে নানা বিচিত্র পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। শুরুতে ছিল এক ধরনের অস্বস্তিকর সহাবস্থান যখন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে উভয়েই নিজেদের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছিল। বিলীয়মান মোগল সাম্রাজ্য থেকে প্রাপ্ত দরবারি নৃত্য ও সঙ্গীত, অতীতের সংস্কৃত সাহিত্য, পারিপার্শ্বিক লোকসংস্কৃতি ও নব্য আগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি--- এই সবকিছুর মধ্যে হাতড়ে বেড়িয়েছে। অপর পক্ষে, নিম্নবর্গের কবিওয়ালারা ঐতিহ্যাশ্রয়ী পৌরাণিক ধর্মভাব ও পরিবর্তনশীল নাগরিক সভ্যতার সামাজিক অরাজকতার ধর্মনিরপেক্ষতার টানাপোড়েনে দ্বিধাগ্রস্ত।'<sup>২৭</sup>

তারপর পুরোনো পৃষ্ঠপোষকদের সময়কালের অবসান হলে নব্য শিক্ষিত শিষ্ট ভদ্র সম্প্রদায় নব্য সাংস্কৃতিক রুচি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রাচীন এবং নবীনের দ্বন্দ্ব। সমালোচক উল্লেখ করেছেন: 'সমাজে ও সাহিত্যে পুরাতনের সহিত নৃতনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। নৃতন দল পুরাতনের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল; পুরাতন নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সমাজকে ও সাহিত্যকে দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। এই ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও সাহিত্য সংক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল।' ২৮

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নব্য সম্প্রদায় তথাকথিত ইতর রুচির পোষক 'অপর' সাধারণের থেকে নিজেদের পৃথক করার কাজেই মনোনিবেশ করেছেন। ফলে শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং 'অপর' সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা দুটি ক্রমশই দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়ে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে অসমকক্ষ অবস্থান থেকে এই লড়াই লড়তে হয়েছে তথাকথিত 'অপর' সাহিত্য-সংস্কৃতিকে।

নতুন নগর কলকাতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে হঠাৎ-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে অভিজাত-অনভিজাতের একত্রে আস্বাদ্য যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তাতে কিন্তু ফাটল দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের মধ্য পর্ব থেকেই। আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত কবিগানে যেভাবে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ (যেমন গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা) মূল কবি বা গায়কের ভূমিকা নিতেন, উনিশ শতকের পরবর্তী দশকগুলিতে মূলত শৌখিন ভদ্রলোকদের তৈরি নানা নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক রূপকল্পে (যেমন হাফ-আখড়াই) নিম্নবর্গের শিল্পীদের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অবসান ঘটেছিল। তাঁরা তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দোহারের স্তরে নিযুক্ত হতেন। তার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে হুতোমের নকশাতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বারোইয়ারি পূজার সময় কলকাতায় ধোপাপুকুর লেনের মুখুজ্যেদের বাড়িতে 'ছোটবাবুর অধ্যক্ষতা'য় হাফ-আখড়াই অনুষ্ঠিত হলে সেখানে দোহারদের অধিকাংশই ছিল 'ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি'<sup>২৯</sup> ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক রুচির বদল ঘটে যাচ্ছিল দ্রুত। ফলে তাঁরা অনেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি প্রদত্ত রঙিন চশমা এঁটে এতকালের প্রচলিত সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক নানা ধারা-উপধারাগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন, সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন শিষ্টবর্গের মর্যাদার উপযোগী বিকল্প। সাহিত্যের ধারায় পাশ্চাত্য মডেলে সৃষ্ট ধারাগুলির প্রাধান্য লাভ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যাত্রার বদলে থিয়েটার, খেমটার পরিবর্তে বাঈনাচ, লোকসঙ্গীতের পরিবর্তে ধ্রুপদী সঙ্গীত ইত্যাদির

বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছিল। পাঁচালি, আখড়াই, ঝুমুর, তরজা, মালসী, কীর্তন, কবিগানের স্রোত ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। সমালোচক জানাচ্ছেন :

'তৎকালীন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা-উপধারার বিরুদ্ধেই নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এগুলির বিকল্প হিসেবে তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব এক সংস্কৃতি যার ভিত্তি হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন এক দিকে অতীতের উত্তর-ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্প ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য শিল্পকলা। তাই বাঈ নৃত্যের প্রশংসার সঙ্গে কালোয়াতি গানের চর্চায় এঁদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। রামমোহন রায়ের আমল থেকেই উত্তর-ভারতীয় ওস্তাদদের নিযুক্ত করে রাগপ্রধান গানের যে অনুশীলন শুরু হয়, তাকে অভিজাত রাজবাড়ির আঙিনা থেকে বার করে এনে এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়াসসাধ্য করা হয় ১৮৭১ সালে Bengal Music School খুলে।'ত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা শহরের প্রথম প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে অর্থের দিক থেকে বৈষম্য থাকলেও রুচির দিক থেকে আত্মীয়তার কমতি ছিল না। কবিগান, কথকতা বা পাঁচালি একই সঙ্গে অভিজাত এবং নিম্নবর্গ উভয় শ্রেণির মনোরঞ্জনেই সক্ষম ছিল। শিক্ষা-অশিক্ষা, শ্লীলতা-অশ্লীলতার ভেদ তখনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। ফলে কেউই তখনো পর্যন্ত সংস্কৃতির বিভাজনকে প্রশ্রয় দেননি। তাই যে বাবুর বাড়িতে ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর বসত, তাঁর বাড়িতেই সমান মর্যাদায় গোপাল উড়ের যাত্রা অনুষ্ঠিত হবার কোনও বাধাই ছিল না। বঙ্গসমাজের প্রচলিত আমোদ-প্রমোদে, বিশেষত নানা লোকগীতি এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে আদিরসাত্মক ব্যঞ্জনা সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই অনুমোদন পেত। দেবদেবীও সেখানে হয়ে উঠত নিতান্ত সাধারণ লৌকিক মানব-মানবী, আর তাদের প্রেমেও থাকত দৈহিক আকাজ্ঞা, ইন্দ্রিয়াসক্তির তাড়না। যদিও তাতে কবিত্বের খুব কিছু হানি হত, এমনটা বলা যায় না। যদিও মিশনারিরা প্রচার করতেন এই দেশের মানুষের আরাধ্য দেব-দেবীদের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। এমন কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ তাঁদের জীবন যে ভাবতেই লজ্জাবোধ হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মোহান্ধ বাঙালির জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার বাসনায় দেশীয় ভাষায় ধর্মপ্রচারের একটা হিড়িক উঠেছিল মিশনারিদের মধ্যে। সেখানে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের পাশাপাশি অন্য ধর্মকে আক্রমণের পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে প্রচুর পুস্তিকা রচিত হত এবং বিনামূল্যে তা জনতার মধ্যে বিতরণ করা হত। এমনকি খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক নানা সাময়িক পত্রিকাও তখন (১৮২৬-৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) প্রকাশিত

হত। তাতে অন্য ধর্মের প্রতি কেমন কুৎসা করা হত তার একটু নমুনা তুলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' নামক পত্রিকাতে উল্লিখিত হয়েছিল :

'হিন্দুরা প্রায় সকলপ্রকার পাপ করে বিশেষতঃ তাহারা দেবপূজারূপ মহাপাপে দোষী আছে ঘৃণ্য দেবপূজাকারি হিন্দুরা কি ধার্মিক। তাহা নহে।...যে দেবতারদের উপর ভরসা রাখে ও যাহারদের সেবা করে সে দেবতারা কি তাহারা মৃত ও অতি দুষ্ট লোক ছিল এবং আপনারা স্বর্গলাভ করিতে পারিল না তবে কি তাহাদের পূজকদিগকে তাহা দিতে পারে। হিন্দুরদের তাবৎ পূজা মিথ্যা পাপ শেষে তাহারা দেখিবে যে এবং ঐ পাপের নিমিত্ত পরকালে দুঃখভোগ করিতে হইবেক।'

যে দেবতারা এমন দোষে দোষী, তারা ভক্তকে স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত মার্গ দেখাতে সক্ষম হয় না, বরং দেবতাদের এই সমস্ত কুরুচিপূর্ণ আচরণ অবশ্যই ভক্তের মনেও প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং তাদের নৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর সেই ভয়েই শ্লীলতার নতুন পাঠ নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে নব্য-শিক্ষিত বাঙালি অভিজাত সম্প্রদায়ের একাংশ। লোকসংস্কৃতির নানা শাখাগুলিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে। তারা মনে রাখতে চায়না যে পরিস্থিতির চাপে এগুলিকেও উচ্ছেদ হতে হয়েছে তাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের আদি শিকড় থেকে। বদলাতে হয়েছে আদি রূপ। সমালোচক বলছেন:

'উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে কখনো সংঘাত, কখনো সমঝোতা, কখনো তার কাছে আত্মসমর্পণ---লোকসংস্কৃতির এই ইতিহাসের নেপথ্যে যে অতীতের গোষ্ঠী আনুগত্যের ঐতিহ্য, সমসাময়িক শহুরে সমাজের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ, লোককবি ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা, এ সব-ই নানাভাবে তার অবয়ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।"

কাজেই তা যদি অশ্রাব্য এবং অশ্লীল হয়েও থাকে, তার জন্য সে একা অভিযুক্ত হতে পারে না। দায়ী যুগ এবং মানুষের রুচিও। আর যে নব্য-রুচি নির্মিত হয়েছে গোরাদের ছাঁচে, তার সঙ্গে পূর্বজের রুচির তফাৎ এবং সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তীকালে প্রবীণ নাট্যাচার্য রাধামাধব কর (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) নব্য বাঙালির পিউরিটান মনোভাব দেখে এবং অতীত ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন :

'আপনারা বোধ হয় ভুলিয়া যান্ যে, তখনও আমাদের সমাজে পুতচরিত্র পুণ্যশ্লোক নরনারীর অভাব ছিল না; কিন্তু তখনকার সেই সঙ্গীতকলাকে আদর করিলে কোনও নরনারীর মনে কোনও প্রকার মলিনতা যে আসিতে পারে, ইহা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিতেন না। পৌরাণিক ঘটনাবিশেষ তখনকার দিনে যাত্রাগানের বিষয়ীভূত হইত। যাত্রার আসরে অথবা কবির লড়াইয়ে সেই ঘটনাটিকে ফুটাইয়া তোলা হইত। এখন এমনটি দাঁড়াইয়াছে যে, অসঙ্কোচে কবির লড়াই লইয়া আলোচনা করা শক্ত। কিন্তু তখন ভদ্রসমাজে কাহারও মনে কোনও খটকা লাগিত না।

তিনি দেখিয়েছেন মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে অনুষ্ঠিত পালায় সত্যবতী পুত্রবধূ অম্বালিকাকে বংশরক্ষার জন্য ব্যাসদেবের কাছে যেতে অনুরোধ করলে অম্বালিকার স্পষ্ট উত্তর :

'যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকরুণ,
ও কথা আমায় ব'ল না।
অমন সদ্য ছেলে বিইয়ে দিতে
অন্য কেউ ত পার্বে না।...
তুমি একবার ক'রে পার পেয়েছ নাইক কিছু ভয়,
যদি কর্তে হয় ত আপনি কর, ঠাকরুণ,
ও কথা আমায় ব'ল না।'<sup>৩8</sup>

এই উত্তরের মধ্যেই সত্যবতীর মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে কুমারী জীবনের সন্তান-প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তা শুনে কোনও ভদ্রলোকই বিষয়টা রুচিহীন ভেবে সভা ত্যাগ করে যাওয়ার চিন্তাও মনে আনতেন না। তিনি আরও বলেছেন :

> 'শ্যামপুকুরে, সিম্লায়, যোড়াসাঁকোয়, কালীঘাটে, বেনেটোলায় যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচালীর দল গান করিত, সঙ্গীতরসজ্ঞ এমন কোনও ব্যক্তি তখন ছিলেন না, যিনি তাহাতে প্রচুর আনন্দ না পাইতেন।'<sup>৩৫</sup>

আসলে কলকাতায় জীবন আর জীবিকা নির্বাহের তাগিদে লোককবি এবং শিল্পীদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশিত বিষয় এবং আঙ্গিকে অভিনবত্ব আমদানি করতে হত। সমালোচক জানাচ্ছেন:

> 'সামাজিক চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁদের নানাভাবে—সুযোগ বুঝে কখনো উচ্চবর্ণের ফরমায়েশ মেনে, কখনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের মাধ্যমে। লড়াইটা ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক—তাঁদের পুরোনো গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অনুসৃত মূল্যবোধের সমর্থনে, ও সদ্য উদ্ভূত ধনতান্ত্রিক

অর্থনীতির বাজারি রীতি-নীতির বিরুদ্ধে। ফলে, তাঁদের সৃষ্টিকর্মে দেখা যায় নানা প্রবণতার জটিল কিন্তু চিত্তগ্রাহী সমাবেশ—ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধর্মানুরাগ, যৌথ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানপ্রীতি, লৌকিক হাস্যরস, নূতন নাগরিক পরিবেশ থেকে রূপকল্প চয়ন'ত ইত্যাদি।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির রাধা-কৃষ্ণ প্রীতির কথা জানা যায়। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলি জুড়ে দেবতার নামটুকু অবলম্বন করে অসামান্য মানবীয় প্রেমলীলার আখ্যান রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে। যুগ পরিবর্তিত হলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার কদর কমেনি। উনিশ শতকের প্রথম প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যেও তখন রাধাকৃষ্ণ লীলার জনপ্রিয়তা ছিল অসীম। নাট্যাচার্য রাধামাধব কর জানাচ্ছেন:

'বৈষ্ণব-শক্তি-সৌর-গাণপত্য নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী বালক-বালিকা, নবীনা-প্রৌঢ়া, স্থবির-যুবক, অধিকারী-অনধিকারী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই শান্ত-দাস্য-সখ্য-মধুর-রসামৃত আকণ্ঠ পান করিত। রুচিবিকারের অবসর ছিল না। এই সমস্ত সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ নরনারী যে নির্ব্বিকার ছিল, এমন কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু তাহাদের আর যাহাই থাকুক, রুচিবিকার ছিল না; রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত পানে তাহাদের কখনও অরুচি হইত না।"

আর এই পালার মধ্যেই প্রয়োজন মত সংযোজিত হত যুগের দাবি। মথুরা নগরপতি এবং বৃন্দাবন-বিলাসিনী হয়ে উঠতেন উনিশ শতকের বাবু সমাজের পুরুষ এবং নারীর প্রতিনিধি। এই সুধা পান করেই তৃপ্ত হতেন পৃষ্ঠপোষক ধনী বাবু-সমাজ। পরবর্তীকালে এঁদের উত্তরাধিকারীরা নতুন ভাবধারায় লালিত-পালিত হয়ে উঠেছিলেন। আর তাঁদের সেই নতুন ভাবজগতে এতকালের প্রচলিত সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোনও স্থান ছিল না। তাঁরা নব্য-শিক্ষার বলে বলীয়ান হয়ে দেশের যাবতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। দেশের পরিচালক হিসেবে ইংরেজ প্রভুশক্তিকে মেনে নিতেও দ্বিধা করেননি। আর সেই প্রভুর নির্দেশিত সমস্ত কিছুই তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল অবশ্য-মান্য কর্তব্য। হুতোম দুই প্রজন্মের পার্থক্য সম্বন্ধে স্বভাবসিদ্ধ রসিক ভঙ্গিতে চমৎকার বলেছেন:

'পূর্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিস্ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না...", তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল ভিন্ন প্রকার। তাঁরা পৈতৃক বিষয়কর্ম, মদ, মেয়েমানুষ, কবিগান, সং, আখড়াই, যাত্রাপালা সহ নানাবিধ আমোদে কাল কাটাতেন। কিন্তু "রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বস্লো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্পেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন-ক্রমে সংকর্মে বাঙ্গালিদের চোক্ ফুটে উঠলো।"

মূলত ইংরেজ অনুমোদিত শোভন এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে তোলাই ছিল উনিশ শতকের শিষ্ট নাগরিকের প্রধান লক্ষ্য। নব্য-অর্জিত গোঁড়া রুচি-বোধ যাত্রা-পাঁচালি-সং-বুমুর-কবিগান-খেমটা ইত্যাদি সবকিছুকেই ভদ্র সমাজের অনুপযুক্ত বিবেচনা করে এদের জীবনের মূলস্রোত থেকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। মানুষের মনে কুপ্রভাব পড়বে এই আশঙ্কার কথা প্রচার করে এগুলি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বারংবার। কেবল বিকল্প খুঁজেই ক্ষান্ত হয়নি, এদের সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। পরিহার করে নিচ্ছিল সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা। এমনকি ইংরেজ শাসকের সহায়তায় আইন প্রণয়ন করে প্রচলিত বিনোদনের সমস্ত পথগুলিকে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল তারা। শিষ্ট অভিজাতবর্গের এই অসহিষ্ণু মনোভাবে বিরক্ত হয়েই একটি সাময়িক পত্রে প্রশ্ন উঠেছিল :

'এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক?...সামান্য লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?'

আগেই বলা হয়েছে উনিশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় নব্য শিক্ষিত বাঙালি অশ্লীলতার নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিল এবং সেই অনুযায়ী তার মাপকাঠি বানিয়েছিল। এই ভাবনার পিছনে ছিল ভিক্টোরীয় নৈতিকতার বোধ। সমালোচক বলেছেন:

'উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের 'অশ্লীলতা'-বিরোধী অভিযান ও তৎপরবর্তী ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুরূপ প্রচার, ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ওই শতকের মধ্যম দশকের ভিতরেই কলকাতায় একটা নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা এই ঔপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতি-নির্ধারিত 'অশ্লীলতা'র সংজ্ঞা পুরোপুরি অন্তঃস্থ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।'<sup>80</sup>

এই অভিযানে শরীর এবং শরীর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল নব্য শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণির আক্রমণের লক্ষ্য। যেহেতু ভিক্টোরিয়ান নীতিবাধ শিক্ষিত বাঙালিকে প্রভাবিত করেছিল নানা দিক থেকে তাই শুধু সদর নয়, অন্দরেও তার ছাপ পড়েছিল। সমস্ত কিছুতে অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া শিষ্ট সমাজের ধারকদের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সভ্য সমাজের 'এটিকেট'। মানুষের চলা-ফেরা, কথা বলা, বসা-দাঁড়ানো সবই স্থিরীকৃত হচ্ছিল সেই নীতিবাগীশদের অঙ্গুলিহেলনে। আলোকায়নের দাবিতে অন্তঃপুরেও সে হাওয়া কিছুটা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। বিশেষত রুচি এবং পরিবর্তিত বাস্তবের দাবি অনুসারে মেয়েদেরও নিজস্ব বেশভূষাতে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। ঢাকা, চন্দ্রকোনা, শান্তিপুরে নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছিল। সাময়িকপত্রে একজন অভিযোগ করেছিলেন:

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্তুই সাধারণ ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষাভাষের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ...যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়।'<sup>85</sup>

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইংরেজ আচরিত এবং প্রচারিত শ্বাসরোধকারী কিছু আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপরে। তাদের বসন, ভূষণ, আচার-আচরণ, জীবনদর্শন সবকিছুর মধ্যেই অশ্লীলতার ছায়া দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তথাকথিত ইংরেজের পুচ্ছানুসারী সমাজ-সংস্কারকেরা। পাশ্চাত্য প্রভু প্রদত্ত নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুর মধ্যে যৌনতার ভূত সন্ধান করে বেড়ানোর প্রবণতা অতিরিক্ত বেড়ে উঠেছিল। ফলে তাঁরা যে শুধু এগুলোর সমালোচনা করেছিলেন তা-ই নয়, যেখানে যেখানে তার সূক্ষ্মতম সূত্র আছে সেগুলিকে চিহ্নিত করে ফেলতে চেয়েছিলেন। শুধু জীবনের নানা ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। যে কাব্যে, যে সাহিত্যে, সংস্কৃতির যে ধারায় নরনারীর সহজ স্বাভাবিক দৈহিক প্রেমের অভিব্যক্তি আছে, কামনার ইঙ্গিত আছে, সেগুলিকেও বেছে বেছে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের অপরাধ অশ্লীলতার পরিপোষণ, ফলে শাস্তি ভদ্রসমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতির সীমা থেকে বিতাড়ন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'উনিশ শতকের কলকাতার লোকশিল্পীরা শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতির ধর্মীয় উপাখ্যান (যেমন রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি) বা প্রণয়-কাহিনি (বিদ্যাসুন্দর) নিজেদের প্রয়োজনমতো কেটে-ছেঁটে, নতুন রং লাগিয়ে ও নতুন উপাদান সংযোজন করে তাঁদের শ্রোতা ও দর্শকদের বিনোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। তাঁদের যাত্রায় কৃষ্ণ ও রাধার লৌকিক সংস্করণ দেখে তাই অভিজাত বাঙালি সমাজের মুখপত্র বঙ্গদর্শন ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিল, তাদের আরাধ্য নারায়ণকে পাড়ার গয়লাতে পরিণত করা হয়েছে! ভারতচন্দ্রের কাব্যের আড়ম্বরপূর্ণ নৃত্যছন্দ থেকে বিদ্যা ও সুন্দর নেমে এল গোপাল উড়ের লোকপ্রিয় খেমটার তালের জগতে। ভদ্রসমাজ তাকে অশ্লীল বলে খারিজ করে দিল। বিষ্

সংস্কৃতির জগতেই যে কেবল এই অশ্লীলতার কারণে টানাপোড়েন চলছিল তা নয়, বাংলা সাহিত্যের জগতকেও তা রীতিমতো আলোড়িত করেছিল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে একটা নতুন ভাবনার জোয়ার এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের নতুন নতুন শাখাও পুষ্পে পত্রে পল্লবিত হয়ে উঠছিল। শিক্ষিত পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল এক নতুন ভাবের দিগন্ত। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না, উনিশ শতকের নবজাগৃতির ছোঁয়ায় ঋদ্ধ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাত গোষ্ঠীর বাইরেও একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। তাদেরও পাঠ-আকাঙ্ক্ষা ছিল। পাণ্ডিত্যের ভার বহন করার সামর্থ্য এবং ইচ্ছা তাদের ছিল না। তারা ছাপার অক্ষরে মানসিক আমোদের সন্ধান করতে চাইত। আর তাদের সেই বাসনা পূরণের অন্যতম স্থান ছিল বটতলা। প্রাথমিক পর্বে তাতে সমস্যাও ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অশ্লীলতা বিতর্ক জনতার দরবারের একচ্ছত্র অধিপতি বটতলার বইগুলিকে বিপদসীমায় ঠেলে দিয়েছিল হঠাৎই। বাইরে যার লক্ষ্য ছিল অধিক সংখ্যক পাঠকের রুচির পরিমার্জন, ভেতরে তারই উদ্দেশ্য ছিল বইয়ের বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। সুতরাং নতুন আলোর প্রভাবে যে কেবল নতুন ধারার নাগরিক সাহিত্য বিকশিত হচ্ছিল তা-ই নয়, জনগণের পাঠ-রুচিকেও লাগাম দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল নানাভাবে। স্বল্প-শিক্ষিত পাঠক এবং লেখকের যুগলবন্দীতে ফুলে ফেঁপে ওঠা বটতলার রমরমা নীতিবাগীশদের চোখ এড়ায়নি। সমালোচক বলছেন:

> 'বটতলা বিখ্যাত হল তার অভিনব বিষয়বস্তুর বইপত্র বের করে যা অন্য কোনও উচ্চরুচির উচ্চবর্গের ছাপাখানা বা প্রকাশক বের করেননি। তাদের কাছে এসব ছিল হীন ব্যাপার। উচ্চমার্গীয় নয় বলে বটতলার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা

অপরত্বের। তাদের জ্ঞান আধিপত্য দিয়ে বটতলাকে অপর করে রেখেছে।<sup>280</sup>

বটতলার বিপুল বিক্রি, অসামান্য জনপ্রিয়তার পাশে তখন রুচি এবং নীতির পরিপোষক পুস্তকগুলিকে প্রায় খুঁজে পাওয়া যেত না। সুতরাং জনরুচির শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বটতলার জঞ্জাল সাফ করতে অগ্রসর হলেন সমাজের 'পিউরিটান' অংশ। যত্রতার রুচিবিকারের সন্ধান পাচ্ছিলেন তাঁরা। একথা তাঁরা সম্ভবত অনুধাবন করতে পারেননি অথবা চাননি যে বই শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল না সাধারণ জনতার কাছে। বই পড়ে সকলে পণ্ডিত হতে চায়নি, চেয়েছিল বিনোদন। উচ্চবর্গীয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার অসারত্বকেও মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি সাধারণ জনতার পক্ষে। ফলে সুযোগ পেলেই এই জ্ঞানচর্চাকারীদের মুখে ঝামা ঘমে দিয়েছে বটতলা। তাছাড়া এই গোত্রের বেশিরভাগ ব্যক্তিই যে দেশের সাধারণ জনতার প্রতি বিমুখ অথচ ইংরেজ প্রভুর অনুগত ভূত্য সেটা বুঝতে বটতলার সময় লাগেনি। তাদের সম্পর্কে বটতলার মৃল্যায়ন স্পষ্ট:

'আমরা ধরিলে দোষ মিছে গোল করে। সাহেবের কাছে হলে নাথি খেয়ে মরে।।'<sup>88</sup>

নব্য সম্প্রদায় নিজেদের বড়ই বিজ্ঞ মনে করে, চারপাশের সাধারণ মানুষকে অজ্ঞ ভেবে অপদস্থ করতে চায়—এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের দ্বিমত ছিল না। ফলে বটতলার নানা পুস্তিকায় রকমারি রচনায় এই জ্ঞানী বিজ্ঞদের বিদ্রূপ করা হত। যেমন কৌতুক শতক নামে এক চটি 'জোক বুক' এ নব্য সম্প্রদায়কে বেশ এক হাত নেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে:

'নব্য সম্প্রদায়েরা দুই ব্যক্তি এক ময়রানীর দোকান হইতে সন্দেশ মিঠাই ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া উত্তমরূপে জলযোগ করিলেন। শেষে ময়রানী মূল্য চাহিলে তাঁহারা কহিলেন ময়রানী! প্রলয় কাকে বলে জান?---জাননা? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ গিয়াছে, কলিযুগ মোটে ৪৩২০০০ হাজার বৎসর, এবছর তার ৪৯৬৩ বছর যাচ্ছে, আর ৪২৭০৩৭ বছর বাকি আছে। এই ক'বছর গেলেই প্রলয় হবে। তাবাদে আবার এসব ফিরে আসবে, তখন আবার আমরা তোমার দোকান হতে এমনিধারা সন্দেশ মিঠাই নে খাবো। তা এখন আমাদিগে ধার দাওনা কেন, প্রলয় পরে যখন এমনিধারা আবার খাবো তখন দাম দোবো।

ময়রানী কহিল "ক্ষেতি কি? গেছেবারের হিসাব চুকিয়ে দাও।"<sup>8৫</sup>

উনিশ শতকের কলকাতায় এভাবেই তৈরি হচ্ছিল শিক্ষার অন্তর্গত এক স্তর-ভেদ। যে প্রসঙ্গে সমালোচক বলছেন :

> 'বড়লোক-গরিব নয়, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ নয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নয়, শিক্ষার অন্তর্গত স্তর-ভেদ, যা আমাদের কাছে এই বিরাট জনগণ বা জনমনকে নতুন ভাবে হাজির করল। উনিশ শতকের বাঙালির সেই নতুন শ্রেণিটাই যেমন মেইনস্ট্রিম জ্ঞান-আধিপত্য তৈরি করল আবার অলটারনেটিভ জ্ঞান পরিসরও নির্মাণ করল।'

বটতলা ছিল সাধারণ মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রকাশের স্থান। সেই চর্চা যত বৃদ্ধি পাবে, উচ্চবর্গীয় অবস্থানের আধিপত্যের দুর্গে ততই ফাটল ধরার সম্ভাবনা প্রবল হবে। সুতরাং সরকার এবং উচ্চবর্গীয় আঁতাতে বটতলাকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

'সমকালীন সমাজনির্মিত 'মান্য' বা শিষ্ট-সাহিত্যের মূল প্রবাহের পাশাপাশি 'বটতলা' সাহিত্যের যে কূলপ্লাবী প্রবাহ বহমান ছিল যা মান্য-সাহিত্যের মূল ধারাটিকেও পুষ্ট করেছে, শুধু পৃথক স্থানিক অভিধা প্রাপ্তি ছাড়া যার প্রাপ্তিকায়িত হবার কথাই নয়, সেই 'বটতলা' সাহিত্য ও প্রকাশনার জগৎ পরিশীলিত এলিটরুচি-লালিত মননের প্রভাবে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের অভীষ্ট শিষ্টতার সীমানা থেকে।'<sup>89</sup>

পরবর্তীতে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পাঠকরা বটতলার খোঁজ রাখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বরং তাঁদের অবজ্ঞাসূচক মনোভঙ্গি এটাই প্রমাণের চেষ্টা করেছে যে বটতলা আদি-রসালো ইতরভাবালু পুস্তকের আখড়া মাত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে বটতলার আদিরসের বইগুলিকে শুধুমাত্র রুচিবিকারের পরিপোষক বলে ভাবা অনুচিত এবং একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। আসলে এই বইগুলির মধ্যে ধরা আছে সামাজিক যৌনতার চিহ্ন। সমালোচক উল্লেখ করেছেন:

'আমাদের বটতলায় আদিরসের বই সামাজিক যৌনতার চিহ্ন হিসাবে গড়ে উঠছে আর তাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, কীভাবে আমাদের যৌনতার বিকল্প বয়ানকে 'অশ্লীল', 'কুৎসিত', 'ব্যভিচার', 'পাপ' বলে নস্যাৎ করা হচ্ছে আর কালে কালে নীতিবাগীশদের হাতে সেই ইতিহাস ধ্বস্ত হচ্ছে।'<sup>৪৮</sup> উনিশ শতকে কীভাবে আমাদের 'কামের নন্দনতত্ত্ব' বদলে যেতে শুরু করেছে পাশ্চাত্য সেব্রুয়ালিটির ডিসকোর্সের প্রভাবে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এখানে। এ অবশ্যই এক জটিল, সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক নির্মাণ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বটতলা না থাকলে বাঙালির যৌনতা বিষয়ক বিতর্ক উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক পরিসরে এই মাত্রা পেত না। এই বটতলাই যৌনতা বিষয়ক বইগুলি প্রকাশ করেছিল। বটতলার রতিশাস্ত্র, রতিবিলাস, রসমঞ্জরী, সম্ভোগরত্নাকর ইত্যাদি বইতেই কামের শিল্পকলা এবং যৌনতার সুখানুভূতির বিষয়ে কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এবং ভিক্টোরীয় নীতিবোধের সূত্র ধরে যেসব যৌনবিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে যৌনতার আনন্দ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বরং এসব গ্রন্থে বলা হয়েছিল এর অপকারিতার কথা। যেমন 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী' গ্রম্ভে লেখক স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন:

'ইন্দ্রিয়সেবনে শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু আমূল কম্পিত হয়, দৈহিক ও মানসিক বল বিশেষ খর্ব্ব হয় এবং সেই সঙ্গে দেহের সারাংশ ক্ষয়িত ও দেহচ্যুত হয়। ইন্দ্রিয়সেবন মাত্রই ক্ষতিকর।'<sup>8৯</sup>

বটতলার বই ব্যবহারের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে একটা লুকোচুরির প্রবণতা। শিষ্ট সমাজে সে স্বীকৃতিহীন, সে অপর। তাকে বাইরে সাজিয়ে রাখা যায় না, রাখা হয় বালিশ চাপা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় উল্লেখ আছে :

> 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা দিদিমায়ের বালিশ তলায় চাপা। আল্গা মলিন পাতাগুলি দাগী তাহার মলাট দিদিমায়ের মতোই যেন বলিপড়া ললাট।'<sup>৫০</sup>

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন :

'চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাসী-রামায়ণই প্রধান।'<sup>৫১</sup>

বলা বাহুল্য এগুলি ছিল বটতলার বই। যার গতিবিধি তথাকথিত অল্পশিক্ষিত মেয়েমহলে এবং শ্রমজীবী নিম্নবর্গের দরবারে। বারবার এভাবেই তা জর্জরিত হয়েছে শ্রেণি বৈষ্যোর অসম্মানে। সমালোচক বলছেন :

> 'বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম লীলাকেন্দ্র বটতলা চিরদিনই শিক্ষিতের উপেক্ষিতা।

নির্বিচার অজ্ঞতার বাণবিদ্ধ বউতলা সাহিত্যের আবর্জনা-স্ভূপে সমাধিস্থ।'<sup>৫২</sup>

তাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড়, তাকে কেন্দ্র করেই সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং আনুগত্যের দ্বন্দ্ব-মুখর রাজনীতি। যার মধ্যে দিয়ে বাজার অর্থনীতির নতুন অঙ্কে বটতলাকে সাফ করে দেওয়ার প্রয়াস। তার ফলেই জনতার দরবারে যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, সেকালের বিপুল সংখ্যক পাঠকের পাঠরুচিকে তৃপ্ত করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য প্রভুর রুচির প্রভাবে প্রভাবিত পাশ্চাত্যমনস্ক শিষ্ট সমাজের দাপটে ক্রমশ বটতলার অন্তিত্ব বিলীয়মান হতে থাকে। তাত্ত্বিক প্রদীপ বসু (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

'বটতলাটা সত্যিই 'আদার' বানানোর রাজনীতিতে 'ভদ্রলোক'দের সমর্থন না পেয়ে উঠেই গেল। বটতলার বই রাখা যেত না 'ভদ্র' বাড়িতে। যদিও বা পড়ত, লুকিয়ে পড়ত। বইগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। সংরক্ষণের কালচারে বটতলা বাতিল ছিল।'<sup>৫৩</sup>

তার ফলেই বটতলার উপযুক্ত সম্মান জোটেনি। তাহলে বটতলার পরিণতি কি হল? সে কি সত্যিই সাহিত্যিক মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল? খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বট-তলানি এখনো আছে কি না। উনিশ শতকের বটতলার বইয়ের বাজারের সামাজিক ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে দেখা যাচ্ছে বটতলাকে প্রান্তিক করে তোলার জন্য উচ্চবর্গের কারিগরি পরিকল্পনা যতই তোড়জোড় করুক না কেন, পুরোপুরি সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি। বটতলাকে নানাভাবে দমনের চেষ্টা হলেও বটতলা-গন্ধী লেখালিখির ধারাকে একেবারে বিনষ্ট করাও সম্ভব হয়নি। যেমন ১৮৭১ সালেও শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত 'আমার গুপুকথা', লেখক ছিলেন কুমার উপেন্দ্রকিশোর দেববাহাদুর। বড়ঘরের নানা কলন্ধ, ব্যভিচার, গুপুপ্রণয়ের সে এক চাঞ্চল্যকর ইতিবৃত্ত। এভাবেই নানা সূত্র ধরে বটতলার ক্ষীণ স্রোত নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। উনিশের আলোকিত প্রহর শেষে বিশ শতকের পর্ব থেকে পর্বান্তরে যখন তাকে ফিরে দেখা হয়েছে, পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে তখনই উঠে এসেছে এসব তথ্য। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত গবেষক বিনয় যোষ (১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টান্দ) বটতলার প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করে এবং পুস্তক তালিকা ঘেঁটে খতিয়ান দিয়েছিলেন যে এখনও বটতলার সাহিত্যকে 'মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

- ১) ধর্মগ্রন্থ—যেমন রামায়ণ, মহাভারত
- ২) যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ—যেমন অডুত ইন্দ্রজাল, গুপ্তমন্ত্র, রাক্ষসী-তন্ত্র

- ৩) বিচিত্র বিষয় শিক্ষার গ্রন্থ—যেমন হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, কবিরাজি শিক্ষা থেকে তবলা-তরঙ্গিনী.
- 8) উপন্যাস—যেমন জীবন-সঙ্গিনী, মনের মত মেয়ে, মন নিয়ে খেলা
- ৫) নাটক ও প্রহসন—যেমন বিপ্লবী বাঙ্গালী, নীলকুঠি, নারী-রাক্ষসী, রূপের নেশা, মিলন-মন্দির ইত্যাদি।'<sup>৫৪</sup>

সামাজিক কাঠামোর তলার দিকে অবস্থানকারী, উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত, নিম্নবিত্ত, দামি বই কিনতে অপারগ বৃহত্তর জনসমাজের চাহিদার কারণেই বটতলা এখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। কিন্তু ভদ্রসমাজের শীতল নিঃস্পৃহতা বটতলাকে করে তুলেছে সাহিত্যিক মানদণ্ডে ব্রাত্য। তথাকথিত মূলধারায় তার কোনও স্থান হয়নি। কর্তৃত্বের অধিকারে, প্রভুত্বের অধিকারে সাহিত্যের মূলধারায় কায়েম হয়েছে শিষ্টবর্গের রাজ।

## তৃতীয় পরিচেছদ

## শিক্ষিত বাঙালি বনাম খাঁটি বাঙালি

এবার আসা যাক উনিশ শতকের নবজাগরণের অনুকূল আবহাওয়ায় জাত এবং পুষ্ট সোনার ফসলগুলির কথায়। ভদ্র শিক্ষিত বাঙালির মূল ধারার যে সাহিত্য---অর্থাৎ যেটাকে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত বলা যেতে পারে—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই তার রূপটি ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছিল। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের হাতেই সেই নাগরিক বাঙালির শিষ্ট সাহিত্য-কৃতির জয়য়য়াত্রা শুরু হয়েছিল। আর এই সাহিত্যই উনিশ শতকের বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম ঋত্বিক বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) হাতে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের সাহিত্য হিসেবে নির্দিষ্ট আইডিওলজির তাত্ত্বিক ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে (১৮১২-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) খাঁটি বাংলার দেশজ কবি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন :

'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি-ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি।'<sup>৫৫</sup>

যদিও এর পরেই তাঁর বক্তব্য:

'এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না-জন্মিবার যো নাই-জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।'<sup>৫৬</sup>

বিষ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে তিনি শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্যসাধকদের যে মানদণ্ড প্রস্তুত করেছেন তাতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথকে। অন্যদিকে খাঁটি বাঙালি কবির শেষ দৃষ্টান্ত তাঁর মতে ঈশ্বর গুপু। সেই ধারা সেখানেই সমাপ্ত। আর জন্মাবার যো নেই, জন্মে কাজও নেই। কারণ বিষ্কিমচন্দ্র মনে করেন খাঁটি বাংলা সাহিত্য বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নয়। যদিও তিনি স্বীকার করেন:

'এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মা'র প্রসাদ'<sup>৫৭</sup> তবুও অশ্লীলতা ভীতিতে পীড়িত হওয়াও বন্ধ হয় না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল বলে মার্জিত পরিশীলিত রুচির পাঠকের জন্য কবিতাগুলি পরিমার্জনার সিদ্ধান্ত নিয়ে জানান আর এতে অশ্লীল কিছু নেই :

'আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি।'<sup>৫৮</sup>

এদিকে নব্য শিক্ষিত ভদ্র-শ্রেণির নাগরিক সাহিত্য নতুন নতুন দিগন্তে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। তা শোভন, সুন্দর, পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা ধারা থেকে অনুপ্রাণিত এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত। উন্নততর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সাহিত্যকে সহযোগী করে তোলার ফলে সাহিত্যও ক্রমশ তার শিকড় হারাতে থাকে। নীতির পরিপোষক বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তার গভীর থেকে তাই কখনো কখনো জেগে ওঠে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ:

'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারাঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়-হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের-আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।'<sup>৫৯</sup>

কিন্তু সে আক্ষেপ দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ পায় না পরিস্থিতির চাপে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিকৃতি বিষয়ে বলতে গিয়ে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও (১৮৪০-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছিলেন :

'এমন সরল ভক্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন? বহুদিন ধরিয়া আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছি, সমস্ত বিষয়েই পশ্চিম হইতে inspiration লইয়া আপনাদিগকে সার্থক মনে করিয়াছি। আপনাদের শব্দসম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশী কথার তর্জমা করিয়া বিদেশী সুরে গান গাহিয়াছি, নহিলে ভিত্তিহীন, বিশেষত্ব, সহানুভূতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইল কেন? এই গুলির কি খাঁটি দেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই?'

### তিনি আরও বলেছিলেন :

'আমার মনে হয় আমাদের সাহিত্যের পর্ণকুটীর হইতে বৈদেশিক 'ভিত্তিহীন' প্রভৃতি শব্দ বহিষ্কৃত করিয়া খাঁটি দেশী কথায় সাহিত্যের চর্চা করিতে হইলে হয়ত প্রথম প্রথম কুটীরগাত্রে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। হয় ত তখন আবার ঈশ্বর গুপ্ত দাশু রায়ের মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক খাঁটি বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে।'<sup>৬১</sup>

আসলে 'বিলাতী রুচির আইনে' আমাদের অনেক প্রাচীন কবি যে 'বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী' তা বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা ছিল না। সেই রুচির মানদণ্ডে বাল্মীকি, কালিদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র থেকে নিকট অতীতের ঈশ্বর গুপু সকলেই অপরাধী, সকলের কাব্যই অশ্লীল। আসলে তাঁরা যখন কাব্যরচনা করেছিলেন তখন কাব্যের বিচার ব্যক্তিগত রুচির মাপকাঠিতে হত না। আর ভিক্টোরীয় নৈতিকতার ছুৎমার্গ তখনও সাহিত্য-ক্ষেত্রকে শ্লীল-অশ্লীলের গণ্ডিতে কেটে ছেঁটে ফেলেনি। তাঁরা যে বিষয়, যে দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করে সাহিত্য সূজন করেছিলেন পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালি, ভদ্র বাঙালি, নাগরিক বাঙালি নিজেদের সভ্য প্রমাণের তাগিদে সেগুলিকে অস্বীকার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তখন রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। অশ্লীলতা বিরোধী অভিযান হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বাঙালির মুখরক্ষার অন্যতম সেরা অস্ত্র। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতটাও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অশ্লীলতার বিপক্ষে বর্রাবর ছিলেন। কিন্তু তিনি এও মনে করতেন যে বিষয়টা স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন :

'এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহা অঞ্লীলতা দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোনও কোনও স্থানে, অঞ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষপক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।'<sup>৬২</sup>

### তিনি সঙ্গত প্রশ্নও তোলেন :

'অশ্লীলতা কি? তাহা আইনে কোথাও পরিষ্কৃত হয় নাই। কি দণ্ডনীয়? এ বিষয়ে মতভেদ সর্ব্বদাই ঘটে।'<sup>৬৩</sup>

দেশীয় সাহিত্যকে নির্বিচারে অশ্লীল বলে দাগিয়ে দিয়ে তাকে ব্রাত্য করে দেওয়া যে উচিত কাজ নয়, একথা তিনি অবশ্যই জানতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর নিদান হল :

> 'জঙ্গল কাটিতে উৎকৃষ্ট কাব্য-কুসুমলতা সকলের উচ্ছেদ না হয়।'<sup>৬8</sup>

যদিও সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে অশ্লীলতার সন্ধান করে তার বিলোপ সাধনের এই কাজ কখনোই জনসমর্থন পায়নি। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বাদ দিলে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। উঠে এসেছিল নানাবিধ প্রতিপ্রশ্ন। সমালোচক বলছেন:

'ইতিহাসের নিয়মে সমাজে কখনোই একটিই মাত্র প্রধান স্বর অনুরণিত হতে পারে না। যে-কোনও দেশের যে-কোনও কালেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত একটি বাদীস্বরের প্রতিস্পর্ধী অন্যান্য বহু বিবাদীস্বরের প্রাবল্য আলোড়ন করেছে যাবতীয় নির্মিত বয়ানকে, অন্তর্ঘাত করেছে ক্ষমতাবান কর্তৃক নির্মিত কাঠামোকে। তাই এই অশ্লীলতা আইন নিয়েও চাপানউতোর শুরু হয়েছিল।' ৬৫

অশ্লীলতা নিবারণী সভার কার্যকলাপ বিষয়ে আপত্তিও উঠেছিল। একটি সংবাদপত্তে প্রকাশিত পত্র থেকে জানা যাচ্ছে :

'শুনিতে পাই, অশ্লীলতা নিবারণী সভার গুণে বটতলায় ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বাক্য নিষ্প্রয়োজন। ফল কথা এই, ইহা বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে কম ক্ষতিকর হইবে না। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে কি ভাল কথা কিছু নাই? উহা কি কেবল অশ্লীলতাময়? ভাল, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কত অশ্লীলতা রহিল, সেক্সপীয়র প্রভৃতির কাব্যে কত অশ্লীলতা রহিল, কেবল বাঙ্গালাভাষার তদনুরূপ পুস্তক সকলে জলাঞ্জলি দেওয়া...কেন?...আপনাদের রুচি আমাদের হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে; সুতরাং মতদ্বৈধ অপরিহার্য।'৬৬

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'Hindu Patriot' এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল :

'যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কাহিনি 'অশ্লীল' বলে নিন্দিত হয়, তাহলে সেই মানদণ্ডে খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক 'বাইবেল' এ Solomon এর Song of Songs অধ্যায়টি কি কিছু কম কামোদ্দীপক? আর শেষে স্পষ্টই বলা হয়েছিল—"…অপরাধের অভিযোগ এনে,

সারাদেশব্যাপী অসচ্চরিত্রতা খুঁজে বার করার জন্য স্বয়ং নিযুক্ত গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দিয়ে, জনসাধারণের প্রিয় আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ ঘোষণা করে, শুধু প্রতিরোধেরই জন্ম দেওয়া হয়"।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভারতচন্দ্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে অসম্ভষ্ট হয়ে কিছু কিছু পত্রিকা তাঁর সমালোচনা করেছিল। যেমন এক জায়গায় প্রকাশিত হয়েছিল :

> 'ভারতের মধুমাখা কবিতা লহরী, অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আব্দার করি। এখন 'ছিঁড়িব' বলি পাড়িয়াছে ধুম। আয় আয় আয় 'বঙ্গদর্শনের' ঘুম।

প্যারী কবিরত্ন গেয়েছিলেন:

'বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার, এ দোষ দর্শনে রোষ না হয় কা'র? অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন, সমালোচন কেন তা'র? ... ভারতচন্দ্র গুণাকরে নিন্দুকেরাই নিন্দা করে, সেরূপ রসমাধুরী ভাষায় কি বেরুলো আর? অদ্যপি কবি সকলে, মুক্তকণ্ঠে কে না বলে, কবিকুলে ছিলেন কণ্ঠরত্নহার। সমকক্ষ নর, মেলা সুদুষ্কর, ভারতে ভারত'তুল্য কবি কেউ হবে না আর।'<sup>৬৯</sup>

আবার 'বসন্তক' পত্রিকার একাধিক রচনায় অঞ্লীলতা নিবারণী সভার সভ্যদের ব্যঙ্গ করে নানা ব্যঙ্গচিত্র এবং রসরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন হাতে 'সক্ষপীরের ভিনাস এন্ড এডোনিস বহি' নিয়ে বাড়ির দিকে আসা ভদ্রলোক সংবাদ পান পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা। তখন তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে 'হা পরমাত্মন আমার ঘরে এই! কাল আমি ভারতচন্দ্রের বহিওলা বেটাকে জেলে দিয়ে এসেছি, আজ আমার ঘরে এই অঞ্লীলতা হাঃ বিধাতা!'

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই অশ্লীলতা-বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের

মধ্যেও ক্রমশ একটা দ্বিধার ভাব জেগে উঠতে থাকে। অঞ্লীলতা-বিরোধী অভিযানের নামে দেশজ সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ওপর নির্বিচারে আক্রমণ তাঁদের চিন্তিত করে তুলতে থাকে। তাঁরা অনুভব করেন এই বিদ্বেষ-বিষ প্রবল আকার ধারণ করে দেশীয় ঐতিহ্যকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলবে। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেন:

'যদি বিদ্যাসুন্দর ত্যাজ্য হয়, তবে সেক্সপীয়ার, বাইরণ, ফিলডিং, সুইফট্, রেনাল্ড, কালিদাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কাহারো পাঠ্য হইতে পারে না।'<sup>95</sup>

তাছাড়া অশ্লীলতা অভিযোগে পীড়িত গ্রন্থগুলির সংশোধন প্রসঙ্গে তাঁর মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হল এই যে :

> 'এরণ্ড তৈল বা শর্করা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় যে সমস্ত কাব্যকে 'রিফাইন' করিবার প্রক্রিয়া ও যন্ত্র অদ্যপি প্রস্তুত হয় নাই।'<sup>৭২</sup>

তাছাড়া অশ্লীলতার শিখণ্ডী খাড়া করে বিদেশি প্রভুশক্তি বশংবদ স্বদেশি অনুচরদের নিয়ে দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছে—এমন একটা সন্দেহ ক্রমশই দানা বাঁধছিল মানুষের মনে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর বিক্রির অভিযোগে যখন বটতলার বই বিক্রেতারা অভিযুক্ত হয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েন তখন শিক্ষিত সমাজ থেকেই কেউ কেউ তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। কারণ অশ্লীলতা দমন আইন অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল এদেশের ও সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের অজুহাত মাত্র। তাই বটতলার কিছু বিক্রেতা বিদ্যাসুন্দর বিক্রির অপরাধে গ্রেপ্তার হলে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুমান করা যায়, এখানে বটতলার আকর্ষণীয় বইয়ের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে বেশি কাজ করেছিল দরিদ্র অসহায় স্বদেশবাসীর প্রতি সমবেদনা আর বিদেশি সরকারের অযথা নাক গলাবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এ প্রসঙ্গে 'মধ্যস্থ' পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে:

'বিস্তর উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালি সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র---যাঁহারা অশ্লীলতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকেও ঐ দায়গ্রস্ত দোকানদারদিগের প্রতি দয়া ও আনুকূল্য বিতরণে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।'<sup>৭৩</sup>

বাবু-সমাজের একাংশ নাগরিক লোকসংস্কৃতির সমর্থনে এই পীড়নের বিরোধিতা করেছিলেন। এদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর বিদেশি সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরোধিতাও করেছিলেন বহুজন। এই উপলক্ষে খ্রিস্টান মিশনারি এবং ব্রাহ্ম সমাজসংস্কারকদের অত্যধিক বাড়াবাড়িকে হিন্দুসমাজ একটা বড় বিপদের কারণ হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। নানা মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল। সমালোচক বলছেন :

পশ্চিমী হাওয়া শন শন বইলেও তা সমগ্র উচ্চ এবং মধ্যবিত্তের ভাবলোক স্পর্শ করতে পারেনি। তথাকথিত নবজাগরণ না ছিল সর্বজনীন, না সর্বাঙ্গীণ। যাঁরা ইংরেজি জানতেন, তাঁরাও ছিলেন মূলত বাংলার প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির অনুরাগী। কিংবা সেই নাগরিক সংস্কৃতির যার প্রেরণা উচ্চমার্গের বিদেশি সাহিত্য নয়, যা একান্তভাবে নাগরিক পরিবেশের ফসল যাতে এই শহরের দৈনন্দিন জীবন নানা ভাবে রঙ্গ ব্যঙ্গে পরিবেশিত। বাবুদের একাংশ তাই একদিকে ভারতচন্দ্র–দাশুরায়ের অনুরাগী, অন্যদিকে কবিয়াল, সঙ্কের গান, কিংবা বটতলার শস্তা প্রহসনেও তাঁদের দিব্যরুচি। অশ্লীলতার নতুন সংজ্ঞা স্বভাবতই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বার্ণ

তাছাড়া তাঁদের মনে এমন সন্দেহও ঘনীভূত হয়েছিল যে এভাবেই আন্তে আন্তে বিদেশি শক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে থাকবে। শাসক হিসেবে তাদের মেনে নিলেও যাবতীয় দেশাচারকে তাদের কথামত রূপান্তরিত করতে বা ত্যাগ করতে হবে—এমনটা মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। আর তাঁদের সে ধারণা সম্পূর্ণ প্রান্ত যে ছিল না তার প্রমাণ নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালিই একে ভালো চোখে দেখেনি। তাদের মনে হয়েছিল, এটা রাজনৈতিক প্রতিবাদ বন্ধ করার উপায়। এর আড়ালে শাসকের অভিসন্ধি কতখানি ক্রিয়াশীল ছিল তা জানার জন্য নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। যদিও মনে রাখতে হবে একসময় রুচি পরিমার্জনের তাগিদে যাত্রাকে ভাতে মেরে থিয়েটারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। শাসকের অনুমোদন নিয়ে এদেশের অভিজাত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই সেটা করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বিনোদনের এই মাধ্যমটি পৃষ্ঠপোষকদের ক্রটি বিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল, যখনই স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় নিল, নতুন ভাবলোকে পদার্পণ করতে চাইল, তখনই তার টুটি টিপে ধরতে দেরি হল না। বিভিন্ন আইনের ফাঁসে উঠতে লাগল তার নাভিশ্বাস। এটাই ক্ষমতার চরিত্র।

বাংলা নাটক এবং নাট্যাভিনয়ের কণ্ঠরোধের অভিপ্রায়ে সরকারের পক্ষ থেকে এদেশে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবর্তন করা হয়। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আমলে (মেয়াদ ১৮৭২-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবজাগ্রত বাঙালির চেতনায় নতুন ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। তার মধ্যে বিকশিত হতে থাকে স্বাদেশিকতার প্রেরণা। হিন্দুমেলায় জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। আর সেখানে প্রথম অভিনীত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) নীলদর্পণ নাটক। আর

এটাই ব্রিটিশ সরকারকে ক্রমশ চিন্তিত করে তুলছিল। তারা মনে করছিল বিদেশি কর্তৃক স্বদেশবাসীর ওপর এই অত্যাচারের দৃশ্য জনগণের চিত্তবিক্ষোভ ঘটাতে পারে, যার ফলাফল ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। তবে নাটকের ওপর আঘাত যে কেবল বিদেশি শক্তি কর্তৃক ঘটেছিল এমনও নয়। এদেশের সমাজপতিদের রোষও অনেকসময় রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির ওপর বর্ষিত হয়েছিল। যেমন চুঁচুড়াতে মধুসুদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের সময় ভাটপাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা উপস্থিত হয়ে নাটক বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে গ্রেট ন্যাশনাল এবং বেঙ্গল থিয়েটারে ক্রমাগত অভিনীত হচ্ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) 'পুরুবিক্রম', কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন', হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান', 'হেমলতা', অমৃতলালের (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) 'হীরকচূর্ণ', উপেন্দ্রনাথ দাসের (১৮৪৮-১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) 'শরৎ-সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ইত্যাদি। এসব নাটকে প্রকাশিত দেশাত্মবোধের উচ্ছুসিত প্রকাশকে স্বাভাবিকভাবেই শাসক ভালোভাবে নেয়নি। বরং তাদের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। ফলে এসব নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্য তারা নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। প্রথমে বলপ্রয়োগে এবং পরে আইনের সাহায্যে তারা এগুলি বন্ধ করার কাজে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠুক এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আকাজ্ফিত ছিল না। কারণ তাতে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ লঙ্ঘিত হতে পারে। আসলে জনমনে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের বিপুল প্রভাবের কথা কখনোই অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নাটক এবং নাট্যমঞ্চ যাতে কিছুতেই ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা পালন করতে না পারে তার জন্যে প্রথমেই তার কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত হয়েছিল নীলচাষের পটভূমিকায়। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার মানুষের মনে আলোড়নও তুলেছিল। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল উৎপন্ন হতে শুরু করলে নীলচামের উপযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। সমালোচক বলছেন:

'ইংরেজরা এরপর চা-উৎপাদনের দিকে নজর দেয়। এবং চা যেহেতু অর্থকরী ফসল সেহেতু এই চাষে ইংরেজরা প্রচুর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত চা-বাগিচাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়।" আর সেই চা-বাগানে কম পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করার জন্যে প্রচুর কুলি কামিনকে নিযুক্ত করা হত, যাদের ওপর চলত অমানুষিক নির্যাতন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের চা-কর দর্পণ নাটকে সেই নরক যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত

ধরা আছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনেই নাটকটি রচিত। ৬ই জুন ১৮৮৫, সঞ্জীবনী পত্রিকায় জানা গিয়েছিল যে পত্রিকাটির লেখকেরাই চা-কর সাহেবদের বন্দুকের প্রথম বলি হতে চলেছে। কেননা তাঁরা লিখেছিলেন "চা পান না কুলির রক্তপান। (তাঁরা) লোকেরদের কানে পৌঁছেছিলেন কুলিদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ও লোকেদের কাছে অনুরোধ চা-খাওয়া বন্ধ করো, অত্যাচারী ব্যবসায়ীদের বয়কট করো।" বি

আরও জানা যাচ্ছে রামকুমার এবং দ্বারকানাথ এই দুই ব্যক্তি ছদ্মবেশে আসামে চাবাগানে কুলির চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন কুলিদের সঙ্গে কেমন নৃশংস আচরণ করা হয় সেটা জানার জন্য। সেসব বাস্তব জীবনের তথ্য সংগ্রহ করেই রচিত হয়েছিল এরকম একটি মর্মস্পর্শী নাটক। বাংলা নাটক সম্পর্কে শাসক যখন এরকম ভাবনাচিন্তা করছিল তখন তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল এদেশেরই একশ্রেণির নীতিবাগীশ প্রভাবশালী সম্প্রদায়। আগুনে ঘি ঢেলেছিল নাট্যমঞ্চে বারাঙ্গনার অনুপ্রবেশের ঘটনা। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দেই নাট্যাভিনয়ে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মহিলা প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল এবং ভদ্র ঘরের মেয়েদের অভিনেত্রী হিসেবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে বারাঙ্গনারাই ছিল ভরসা। কিন্তু ভদ্র ঘরের যুবকেরা বেশ্যাদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেবে এটা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং রঙ্গমঞ্চে যখনই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বারাঙ্গনাদের আগমন ঘটেছিল তখনই তথাকথিত ভদ্র-শ্রেণি ঘৃণা এবং শঙ্কায় শিউরে উঠেছিলেন। সংসার রসাতলে যাওয়ার সম্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাই 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল:

'কুক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন।...ন্যাশনালের প্রমীলা যখন কটিতে কীরিচ আঁটিয়া দুলিতে দুলিতে বলিতে থাকে, 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' তখন মনে হয়, তা বটেত, তোমার বাঁধা হুঁকা, কুশলে থাক—তোমার ডর কি?...গোঁফ কামান, দাড়ি কামান, স্বর মোটা, বাপে তাড়ান, এন্ট্রান্স ফেল, প্রমীলা স্বীকার করি শ্লাঘার সামগ্রী নহে। কিন্তু হৃদয় পোড়া, মনপোড়া, লজ্জা পোড়া, ঘর পোড়ানি—মেছোবাজারের প্রমীলার অপেক্ষা লক্ষগুণে ভালো।'

একদিকে সমাজনীতির প্রশ্ন, অন্যদিকে চরিত্র শ্বলনের ভয়, একদিকে সামাজিক সম্মান, অন্যদিকে ঘরের কেচ্ছা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক, সব মিলে অভিজাত সম্প্রদায় তখন চিন্তায় আকুল। সমালোচক বলছেন:

'নীতিবাগীশের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন অভিজাত বাঙালি সম্প্রদায়ের নাটকশাসনের প্রয়াস। কারণ, অনেক ধনী বাঙালির এবং বড় ঘরের কেচ্ছা প্রায়ই প্রহসন বা রঙ্গনাট্যের বা নক্সার মাধ্যমে প্রকট করা হত। তার উত্তোর-চাপানও চলত পরস্পর পক্ষের পয়সার মদতে।...প্রহসনগুলি অভিনয়ের দ্বারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আক্রমণে যাতে পর্যুদস্ত হতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে অনেক বাঙালি সন্তানই নাট্যজগৎ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শাসকের হাত শক্ত করেছিলেন।'<sup>৭৭</sup>

ফলে এই আইন তাঁদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। তবে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের উপলক্ষ হিসেবে দেখা দিয়েছিল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন। এখানে যুবরাজ বলতে রানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র 'প্রিন্স অফ ওয়েলস'কে বোঝানো হয়েছে। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় পদার্পণ করেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয় যে তিনি অভিজাত বাঙালির অন্দরমহল এবং অন্তঃপুরিকাদের দেখবেন। সেকালে এটি ছিল ভয়ানক প্রস্তাব। ভদ্রসমাজের মেয়েরা তখন একান্ত পরিচিত পুরুষ ছাড়া পরপুরুষের সামনে বিশেষ আসতেন না। যদিও প্রিন্সের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি। হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের অন্তঃপুর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ঘটনা নগর কলকাতার বুকে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। সংবাদপত্রে ছিছিক্কার হয়েছিল। এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস একটি প্রহসন রচনা করেন, যার নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে এই প্রহসন অভিনীত হল। ২৩ ফব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের সঙ্গেও এটি অভিনীত হল। দর্শকেরা সকলে উপভোগ করলেন। কিন্তু রাজভক্ত প্রজাকে বিদ্রূপ করায় এই নাটক বন্ধ করে দিতে চাইল সরকার পক্ষ। তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকের নাম পালটে করে দিলেন 'হনুমান চরিত্র'। ক্রমে তাও নিষিদ্ধ হলে তখনকার পুলিশসুপার মিঃ ল্যাম্ব এবং পুলিস কমিশনার মিঃ হগকে ব্যঙ্গ করে 'দি পুলিস অফ পিগ অ্যান্ড শিপ' নামে প্রহসন রচিত ও অভিনীত হল। এসব দেখে শুনে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি লর্ড নর্থব্রুক (কার্যকাল ১৮৭২-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা নাটকের উদ্দেশ্যে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন যেখানে বলা হল :

'...to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest.'

এরপর অশ্লীল নাটক অভিনয়ের দায়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন নিয়োগী সহ অনেক জনকে গ্রেপ্তার করা হল। যদিও পরে তাঁরা বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। মার্চ মাসে Dramatic performances control Bill নামে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হল। এই বিলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি উঠলেও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিলটি আইন রূপে স্বীকৃত হল। এরপরেই ক্রমশ ব্রিটিশ শাসকের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৪ মার্চ, ১৮৭৮) এবং আর্মস অ্যাক্ট (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ)। এভাবেই হরণ করা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের বলেই এদেশীয়দের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব কার্যকরী হল। সমালোচক বলছেন:

'ইংরেজ সুকৌশলে তাদের রাজ্যশাসন মসৃণ করার তাগিদে রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেল এদেশের প্রভাবশালী অভিজাত ও বুর্জোয়াদের এবং শিক্ষিত নীতি ও রুচিবাগীশের দলকে। এদের সমর্থনে ইংরেজ নাটকে অশ্লীলতার দোহাই তুলে কূটকৌশলে সমাজনীতিরক্ষার দায় যেন নিজের হাতে তুলে নিয়ে দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চেয়েছিল। দু'পক্ষই থিয়েটারে দুর্নীতি মুক্ত ও কেচ্ছাকেলেঙ্কারির দায় মুক্তি হল ভেবে ইংরেজ সরকারকে সাধুবাদ জানালেন। অথচ ইংরেজ বাইরে অশ্লীলতার অজুহাত তুললেও, ভেতরে ভেতরে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বার্থকেই বড় করে তুলেছিল।'<sup>৭৯</sup>

ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয় প্রশাসন একটা বিশেষ ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছিল। শাসকের শাসন আর শোষণের প্রয়োজনেই এমনটা করা হয়েছিল, সন্দেহ নেই। ক্ষমতা-কেন্দ্রের বলয়ে থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে প্রান্তে থাকা মানুষগুলোর ছিল বহু যোজনের ব্যবধান। আর গোটা উনিশ শতক জুড়ে তার প্রতাপ তো ছিলই, এমনকি বিশ শতকের সূচনাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) সেসময়ের কথা উল্লেখ করেছেন:

'বাঙ্গালা নাটকের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হচ্ছে পুলিস। নাট্যশালার কলা ছাড়াতে পুলিসই পুরোহিত। নাট্যকলাকে কলাতলায়ও দাঁড় করাতে পারেন বা কলা দেখিয়ে বিদেয়ও করতে পারেন একমাত্র বড় পাহারাওয়ালারা। আমরা যেমন মনে করি, উড়ে মাত্রেই মালী…তেমনই নিজের বাঙ্গালা না জানা থাকায় ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীরা মনে করেন যে, বাঙ্গালীমাত্রেই বিদ্যাসাগর। সুতরাং মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় কবিগণের কাব্যের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে হেডকনস্টেবল বা সাব-ইনস্পেক্টারদের হাতে। '৮০

# চ তুর্থ প রি চ্ছে দ বিদ্বৎসমাজের ত্রিশঙ্কু অবস্থান

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দু'তিনটি দশক ছিল অস্থির সময়-আবর্তে বাঙালির নিজস্ব সত্তা সন্ধানের কাল। নিদ্ধিয় ভাবে অন্ধ অনুকরণ নাকি সক্রিয়ভাবে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগের চেষ্টা, কোন পথে যাওয়া উচিত—দ্বিধাগ্রস্ত এই দুই প্রান্তের মধ্যেই তখনকার বিদ্বৎসমাজের ত্রিশঙ্কু অবস্থান! একদিকে রাজভক্তি এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে ক্রমশ জেগে উঠতে থাকা আত্ম-অভিমান! সমালোচক বলছেন:

'নব্য বাঙালি বাবুদের কল্পনায় তখন গগনস্পর্শী উচ্চাশা। বায়রন মিলটন তাঁদের কাব্যের ক্ষেত্রে আদর্শ, মিল বেস্থাম তাঁদের যুক্তিবাদের গুরু। তাঁদের সাহিত্য-সাধনার ভাব এবং ভাষায় এই ইউরোপীয় চিন্তার আদর্শ, রোমাঙ্গীয় কল্পনার তীব্র চোরা স্রোত এবং নৈতিকতার আদর্শ। আঙ্গিকের ভাঙচুরে দেশজ সংস্কৃতির শিকল কাটার উল্লাস, অলংকৃত ঐশ্বর্য। তাঁদের সাহিত্যে এই নবজাগ্রত আলোকিত বাঙালি-মধ্যবিত্তের জীবনবোধটাই ছিল বড়ো কথা। সেই আলোকায়নের তলাকার অন্ধকারটা এই বাঙালি ভুলতেই চাইতেন। উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার শিকলে আস্টেপ্ঠে বাঁধা বাবুদের অসহায়ত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতার অলীক স্বপ্ন আর এক পিতৃপুরুষের ধর্মের বর্মেই যাবতীয় অহংবোধের চরিতার্থতা।

আসলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলে মিনিট্স বাংলাদেশের সামাজিক বাতাবরণে এক বিপুল পরিবর্তন আনে। বিদেশি ভাষা শিক্ষার ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলে যেতে থাকে। এক নতুন আশার আলোয় ভরে উঠতে থাকে নব্য বাঙালির হৃদয়। তখনও বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়েনি তাদের স্বপ্ন। ক্রমশ দিন যত এগোতে থাকে ততই নানা ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গের ঘটনা ঘটতে থাকে। কর্মস্থলে বৈষম্য বেড়ে উঠতে থাকে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কেরানী-দর্পণ থেকে জানা যাচ্ছে:

'একি কম ঝক্মারি! চাকরি করতে এসে চোরের মতন থাকতে হয়, একটী কথা বল্তে পাওয়া যায় না। এ জন্মটা ভয়ে ভয়েই গেল...কেন বাবু লেখাপড়া শেখা, মুটের কাজ করে খাওয়া ভাল। এ ইস্কুলের মাইনে দিয়ে, কালেজের মাইনে দিয়ে শেষে এই হলো আর কি, ডিগ্রি পেলেম মিথ্যা বলার জন্য, প্রবঞ্চনা করার জন্য, ছদ্মবেশি হবার জন্য; All moral principles, learned in schools and colleges at the expense of paternal money, are at last offered [যদ্] into the feet of an Office Superintendent, to procure a কেরানীগিরি। তিন্তু

ততদিনে কলকাতার শিক্ষিত বাবুরা স্বদেশের শিকড় থেকে বিচ্যুত, বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। উন্নয়নের স্বপ্নে নিজেদের যুক্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভুশক্তির কাছে সঁপে দেওয়ার পর আকাজ্জিত ফল না মেলায় সর্বব্যাপী হতাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই হতাশা এবং ক্ষোভ থেকেই অঙ্কুরিত হয় জাতীয়তার বীজপত্র। এই পর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ক্রমশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির একপ্রকার আত্মাভিমান জন্ম নিচ্ছিল। সেই আত্মাভিমানকে চিহ্নিত করা যেতে পারে জাতীয়তাবাদ হিসেবে। তা জেগে উঠছিল মূলত ধর্ম এবং প্রাচীন সাহিত্যকে আশ্রয় করে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হল। নানা বিখ্যাত লেখকের হাতে পুরাণের নব মূল্যায়ন ঘটল। আলোকিত প্রহরের প্রদীপের তলায় জমে থাকা অন্ধকার ক্রমশ ধরা পড়তে লাগল ত্রিকালদর্শী স্রষ্টাদের কলমে। একথা বললে ভুল হবে না যে আমাদের অহমিকাপূর্ণ রেনেসাঁসের খণ্ডতার মধ্যে আমাদের জাতীয়তার অসম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিহিত ছিল।

এদিকে প্রাথমিক মোহভঙ্গের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের ভালো-মন্দ বিচারের বোধ আন্তে আন্তে ফিরে আসছিল। প্রাচ্যের সমস্ত কিছুই নিকৃষ্ট এবং পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুই উৎকৃষ্ট---সেই ভাবনার যেমন বদল ঘটেছিল, তেমনই কৃতকর্মের পর্যালোচনা করার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল। আত্মসমালোচনার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতার সংঘাতের সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হলাহল এবং অমৃতকে পৃথক করার শক্তি না থাকায় নতুন দিনের নতুন সমাজ অমৃতের আস্বাদের হাতছানিতে আকণ্ঠ পান করেছিল গরলকেও। ফলে যে শিক্ষা, যে সংস্কৃতি, যে সভ্যতার আশ্রয়ে স্বাবলম্বী এবং সচেতন মানুষ তৈরির কথা ছিল, সেখানেই তৈরি হয়েছিল কিছু কলের পুতুল। বেঁধে দেওয়া বুলি ছাড়া যারা আর কিছু বলতে পারে

না। নিশ্চেতন অনুভবহীন কলমপেষা মজুর হয়ে উঠেছিল তারা। তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন চিন্তার পরিসর ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ভাবনার দৈন্য দেখা দিয়েছিল। বিদ্যার নামে কেবল সঞ্চিত হচ্ছিল তথ্যের রাশি, কিন্তু অর্জিত বিদ্যাকে জীবনে প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে চৈতন্য-শীল মানুষ শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই শঙ্কার কথা সেকালের সংবাদপত্রের পাতা খুঁজলে আজও পাওয়া যাবে। যে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজ শাসন ভারতের পক্ষে আশীর্বাদ, সেই তত্ত্ববোধিনীতেই প্রকাশিত হয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেক্ষিতের একটি প্রবন্ধ। সেখানে লেখক ইংরেজি শিক্ষার বিষময় ফলাফল দেখিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্য বশীকরণ শক্তি শিক্ষার্থীর বিদ্যা-বুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে. আর তার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়. ভালো-মন্দ বিচারের বোধ আর থাকে না। তারা তখন 'পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিতে", "সঙ্ সাজিতে", "গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চলিতে", "শুক পক্ষীর ন্যায় কথা কহিতে" পারে, কিন্তু অধীত "বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ" করতে পারে না। নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে না। সেই উদ্যম এবং সামর্থ্য হারিয়ে যায়। করার মধ্যে থাকে কেবল 'ইংলন্ডের স্তৃতিবাদ, ইংলন্ডের জয় ঘোষণা, শক্তের অনুগত্য! আর কি? না অশক্তের প্রতি পীড়ন, অশক্তের উপর প্রভুত্ব...ইহারই নাম বিদ্যানুশীলন!!' এই বিদ্যানুশীলনের পরিণতি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) বলেছিলেন :

> 'ইস্কুল-কলেজগুলা উঠিয়া গেলে যে বাস্তবিক আমাদের সমাজের লোক-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে, এমন ত মনে হয় না। বরং সমাজের কল্যাণকর সুশিক্ষার প্রবর্ত্তনে সুফল ফলিতে পারে। নহিলে আমরা যতই কেন 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' বলিয়া চীৎকার করি, আমরা কিছুতেই স্বদেশী হইতে পারিব না। …বিদেশী শিক্ষায় বাল্যকাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার বাঙ্গালী সন্তান যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে কেমন করিয়া স্বদেশী হইবে?'<sup>৮8</sup>

আসলে সেই সময়-পর্বে বিলেতি অনুকরণের উদ্ধাম নেশা কিছুটা কাটার পর জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ-লগ্নে স্বদেশপ্রেমের প্রতি একটা আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার একটা উচ্চকিত প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ না থাকলে সেই স্বদেশপ্রেম অর্থহীন। তার মধ্যে নিহিত খণ্ডতার ছবিটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সময়ের ছবিটি তুলে ধরে সমালোচক বলছেন:

আজকালকার ডিমোক্রেসির দিনে কেহ কাহারও authority মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলে স্ব-স্থ-প্রধান। সকলেই চরিত্রে যেন একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়; সেইটাকে তাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন; এবং সেই কল্পিত independence-এর গর্বের করেন। এই স্বাধীনতা তাঁহারা দেখান,---কোথায়? গৃহের মধ্যে।...ঘরের বাহিরে অকারণে অথবা সামান্য কারণে বিদেশীর পদানত হইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ কর না; সেখানে তোমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা দেখাইবার চেষ্টা নাই; যত তোমার independence of spirit ঘরের মধ্যে!...তুমি patriotism-এর আস্ফালন কর! তোমরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান; স্বদেশের সঙ্গে কোথায় তোমাদের সংযোগ আছে? দেশের সমাজের কোনও স্তরের কাহারও বেদনায় কখনও ব্যথা বোধ করিয়াছ কি? স্বদেশী সভ্যতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছ কি?' দ্ব

স্বদেশের প্রতি, শিকড়ের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ না থাকলে, নিজের অতীত এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন না হলে, কেবল অন্ধভাবে পরের অনুকরণ করলে তার ফলাফল হয় ভয়ানক। সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন :

'ধার করা ফুল পাতায় গাছকে সাজাইলে তা আজ থাকে কাল থাকে না।...বিদেশের বেশভূষা ভাষাভঙ্গি আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বিদেশের শিক্ষা-রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জীব ও নিম্বল হয়---কারণ তাহার পশ্চাতে সু-চিরকেলে ইতিহাস নাই; তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহা শিকড়ছিন্ন।' ৮৬

এই লগ্নতাহীনতার অভিশাপ ভারতবর্ষের আগামীকে করে তুলবে কলোনির দাসমাত্র, এই আশঙ্কা গোপন থাকে নি। ইংরেজের প্রতি অটল বিশ্বাসের ভিত কেঁপে যাচ্ছিল। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল :

'বিজাতীয় রাজার অধীনে প্রজাগণ সম্পূর্ণ সুখ হয় না…বিজাতীয় রাজ্য হইলে অগ্রে আত্মস্বার্থ ও স্বজাতির ইষ্টসিদ্ধি না করিয়া প্রজাহিতে মনঃসংযোগ করেন না।'<sup>৮৭</sup>

পরবর্তী সময়েও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে প্রকট হয়েছিল কলোনির শিক্ষার নিরর্থকতার কথা, যে শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার বা চরিত্রের বলিষ্ঠতা কিছুই ঘটেনা, তারা শেখে কেবল 'মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে।' প্রকৃত শিক্ষার অর্থই তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া প্রভুত্বের তর্জনীতে

শাসিত হতে হতে এই দেশ শুধু বহিরঙ্গে জীর্ণ হয়নি, অন্তরঙ্গেও নিঃস্ব হতে থেকেছে। তাই হয়তো নিজেদের সমস্ত সম্পদের কথা ভুলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের জন্যও পরমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজন ক্রমশ বেড়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৬ খ্রিস্টান্দ) বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন বিভিন্ন লোক আখ্যান। সযত্নে সেগুলিকে লেখ্য রূপ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'ঠাকুরমার ঝুলি'। আর তার ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা তে তিনি বলেছিলেন:

'ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখানকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।'৮৯

প্রখ্যাত সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন যে এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বীক্ষণ কেন্দ্রে আছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ, বিদেশি শিক্ষার ফলে দেশীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবুক-জনেরা। তাদের মধ্যে দেশীয় শিল্পচর্চা প্রায় লুপ্ত, আগের মতো প্রাচীন সারল্যে তারা সাড়া দেয় না, এক দুরারোগ্য স্মৃতিভ্রংশতার ব্যাধি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। '১০

বরাবরই উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয় সেই সম্পর্কের সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল শেষ কথা। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি বাঁধা থাকে আধিপত্য ও আনুগত্যের এক বিশিষ্ট কাঠামোয়। আর সেই সূত্র ধরেই আসে দ্বন্দের পটভূমি। পারস্পরিক সংঘাতের শেষে পরিণামে আসে একপক্ষের জয় এবং অনিবার্যভাবেই অন্যপক্ষের পরাজয়। এখানেও আমি উনিশ শতকের কলকাতার বুকে ঘনিয়ে ওঠা শিষ্ট নাগরিক এবং তথাকথিত অপরের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দের ফলাফলকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারে সমাজে চিরকালই প্রভূশক্তি এবং তার বশংবদ গোষ্ঠীর অনুমোদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি যথাযোগ্য সমাদর এবং মান্যতা পায়। আর তাদের দ্বারা অনুমোদন লাভে ব্যর্থ যা কিছু, তাই হয়ে যায় মূল্যহীন। মূলধারার কাঠামোয় তার কোনও স্থান থাকে না। তাকে কৌশলে অপর করে তোলা হয়। নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হয়। তার বিচরণক্ষেত্রকে সন্ধুচিত করে দেওয়া হয়। হরণ করা হয় তার উপস্থাপনার স্বাধীনতা।

আরোপিত হয় নানা বিধিনিষেধ। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুতরাং অনেক সংগ্রাম সত্ত্বেও ক্রমশ উনিশ শতকের দেশজ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্রম-অপসারণ ঘটেছে। আইন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের তর্জনীতে সায় দিয়ে শোষক ও শোষিতের, কলোনিয়াল ও কলোনাইজ্ড এর মধ্যে চিরস্থায়ী করেছে আবহমান বিচ্ছিন্নতাকামী ভাবনার মূল। সেই মূলের দীর্ঘায়ত বিস্তারে উনিশ শতকের দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতি হয়েছে আলো-আঁধারের বৈপরীত্যে দিশাহারা।

### উল্লেখপঞ্জি

- ১. চক্রবর্তী, শ্যামলী, *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০, পৃ ১৪১-১৪২
- ২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪২২, পৃ ৬২৮
- ৩. ওই, পৃ ৬৩৩
- 8. গুহ, রণজিৎ, *নিম্নর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পু ২৩
- ৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্যাকসোয়ান, হিমায়ৎনগর, হায়দ্রাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃ ১৭৩
- ৬. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, বদ্মাএস জব্দ ও ইংরাজ রাজনীতি, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই (২), গাংচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ১৮৩
- ৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ১২২
- ৮. ওই, পৃ ১৩৮
- ৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* পু ১৭৬
- ১০. ওই, প ১০২
- ১১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* নিউ এজ পাবলিকেশন প্রা লি, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ ১০১
- ১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ওই, পু ১৩২-১৩৩
- ১৩. পত্রী, পূর্ণেন্দু, *বঙ্কিম যুগ, প্রথম খণ্ড* (১৮৩৮-১৮৫৮), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পু ৩১০
- ১৪. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* অরুণ নাগ সম্পাদিত সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ ১৪১
- ১৫. ওই, পৃ ১৪২
- ১৬. ওই, প ১৩৪
- ১৭. ওই, পৃ ১৩৩

- ১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* পু ২৫২
- ১৯. বসু, অমৃতলাল, পুরাতন পঞ্জিকা, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রসরাজের রসকথন*, সংবাদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৭০
- ২০. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, দুর্ভিক্ষ, ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, প্রকাশসাল অনুল্লেখিত, পু ১৬৪-১৬৭
- ২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* পৃ২১৯
- ২২. বসু, অমৃতলাল, পুরাতন পঞ্জিকা, পু ৭১
- ২৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পৃ ১৩৫
- ২৪. বসু, অমৃতলাল, *পুরাতন পঞ্জিকা,* পৃ ৭৫
- ২৫. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, বদ্মাএস জব্দ ও ইংরাজ রাজনীতি, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই (২), পু ১৮৩-১৮৪
- ২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুরাতন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২, পু ১৬১
- ২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ১১৪
- ২৮. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অগস্ট ১৯৮৯, পু ৪৯
- ২৯. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, পু ৭৬
- ৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পু ৯৬
- ৩১. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ ২১৫
- ৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পৃ ৩৭
- ৩৩. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, ওই, পৃ ২৩৭-২৩৮
- ৩৪. ওই, পৃ ২৩৯
- ৩৫. ওই, পৃ ২৪৩
- ৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ *শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পু ৬৮
- ৩৭. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, ওই, পু ২৪৬
- ৩৮. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পু ১০৫-১০৬
- ৩৯. বসন্তক, দ্বিতীয় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪
- ৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পু ২৭৫
- ৪১. ওই, পৃ ২৭৬
- 8২. ওই, পৃ ৩৪
- ৪৩. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), বউতলার বই (১), গাঙ্চিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পু ২২
- 88. ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত *বটতলার বই (১),* পু ২৯৯
- ৪৫. মিত্র, হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত, বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), *বটতলার বই (১),* পৃ ৭৯
- ৪৬. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), *বটতলার বই (১),* পু ১২-১৩

- 8৭. নন্দী, শর্বরী, *আলোর ফাঁদ ও বটতলা সাহিত্য*, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত বাঙালির বটতলা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পু ১৬৩
- ৪৮. বিশ্বাস অদ্রীশ ও আচার্য অনিল, সম্পাদকের নিবেদন, ওই, পৃ ১২
- 8৯. ঘোষ, সূর্যনারায়ণ, *বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী,* পৃ ৩২-৩৩। তথ্যটি গৃহীত হয়েছে *বাঙ্চালির* বটতলা থেকে, পৃ ২৭
- ৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যাত্রাপথ, আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ ৬৪
- ৫১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সাধারণ সংস্করণ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১২
- ৫২. ঘোষ, বিনয়, বটতলার সাহিত্য, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, বাক্ সাহিত্য (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৩৯৯
- ৫৩. অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত বাঙালির বটতলা, পু ৩৪
- ৫৪. ঘোষ, বিনয়, *বটতলার সাহিত্য,* ওই, পৃ ৪০০
- ৫৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব,* বঙ্কিম রচনাবলী ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পু ১০৬০
- ৫৬. ওই
- ৫৭. ওই, পৃ ১০৬১
- ৫৮. ওই, পৃ ১০৮৩
- ৫৯. ওই, প ১০৬০
- ৬০. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, ওই, পু ৫৮
- ৬১. ওই
- ৬২*. বঙ্গদর্শন,* পৌষ, ১২৮০
- ৬৩. ওই
- ৬৪. ওই
- ৬৫. নন্দী, শর্বরী, *আলোর ফাঁদ ও বটতলা সাহিত্য*, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত বাঙালির বটতলা, পৃ ১৬১
- ৬৬. ভারত সংস্কারক, ২৬ বৈশাখ, ১২৮১ (৮ মে, ১৮৭৪)
- ৬৭. *Hindoo Patriot,* September 27, 1873. তথ্যটি গৃহীত হয়েছে উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ২৮২
- ৬৮. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, পু ২৭৬
- ৬৯. ওই, পৃ ২৭৭
- ৭০. শ্রীপান্থ, বটতলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৩, পৃ ৪৩
- ৭১. মধ্যস্থ, ফাল্পুন, ১২৮০। তথ্যটি গৃহীত হয়েছে উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ২৮২
- ৭২. ওই
- ৭৩. মধ্যস্থ, ফাল্পুন, ১২৮০
- ৭৪. শ্রীপান্থ, ওই, পু ৪৪

- ৭৫. সরদার, মহঃ আবদুর রফিক (সম্পাদিত), *বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, পু ১৫
- ৭৬. চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ১২৫
- ৭৭. ওই, পৃ ১২৬
- ৭৮. ওই, পৃ ১২৮
- ৭৯. চৌধুরী, দর্শন, ওই, পৃ ১৩০
- ৮০. বসু, অমৃতলাল, পুরাতন পঞ্জিকা, পৃ ৭৩
- ৮১. মিত্র, দীনবন্ধু, সধবার একাদশী, মলয় রক্ষিত সম্পাদিত সধবার একাদশী পুনর্বিচার, অক্ষর প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পু ৪৭
- ৮২. কেরানী দর্পণ নাটক, ১৮৭৪, পৃ ৩৪। তথ্যটি গৃহীত হয়েছে হার্দিকব্রত বিশ্বাসের *বঙ্গসমাজ* সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা, বাঙালির বটতলা থেকে, পৃ ২৭৫-২৭৬
- ৮৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ওই, পৃ ১৩৫-১৩৬
- ৮৪. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, ওই, পু ২৬০
- ৮৫. ওই, পৃ ২৬৩-২৬৪
- ৮৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *নববর্ষ, ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪২২, পু ৭০৩
- ৮৭. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পু ২৮৯
- ৮৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১, পৃ ৫৬৭
- ৮৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, *ঠাকুরমা'র ঝুলি,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তত্রিংশৎ সংস্করণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পু ৯-১০
- ৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ওই, পৃ ৬৭